হো, নীল ঘোড়েকা সওয়ায়

তাপস ঘোষ

১। ঝুলন্ত পাথরের চাঙড়টি যেদিন মাথায় ভেঙে পড়ে, সহসা

১৮/১১/৮৭ মানে পল্লবীর সংগে রেজিস্ট্রী ম্যারেজের ঠিক ১৮ দিন আগে তরু ঘাটশীলা বেড়াতে গিয়েছিল। সংগে অমিয়ও ছিল। ওখানে তখন তরুর মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার-কাম - চলচ্চিত্রানুরাগী বন্ধু বিভাস থাকত। হিন্দুস্থান কপারের কলোনীতেই। কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্স্-এ জীবনে ঐ একবারই নেমেছিল তরু। আর তামার খনিতে নামা মানে যার নাম সীতার পাতাল প্রবেশ। গভীর কুয়োর মত এক উল্লম্ব টানেল ধরে খনির লিফট তাদের নিয়ে নামছে তো নেমেই যাচ্ছে। মাঝখানে এতগুলো বছর কোত্থেকে কেটে গেছে তাই আজ আর মনে পড়ে না মাটির ঠিক কতটা নীচে নেমেছিল তারা। শুধু আবছা মনে পড়ে লিফট থেমে গেল, মুসাবনীর সেই তামার আকরিকের খনিটিতে ঢুকে বিভাস সম্ভবত বলেছিল যে তারা এখন পৃথিবীর তল থেকে প্রায় ৩০০০ ফুট নীচে।

'পড়াশোনা করে জীবনে এত নীচে নামতে হবে কখনো ভাবি নি'— বিভাসের দ্ব্যর্থক কথাটায় তরু ও অমিয়র সংগে অন্য ভিজিটরেরাও হেসে উঠেছিল। পুরো গ্রুপটার গাইড ছিল বিভাস। বিভাসের আর একটা কথা পরিষ্কার মনে পড়ে আজো। যেখানে খনন চলছে সেখানে গিয়ে অন্যান্য ভিজিটরদের দিকে তাকিয়ে ও বলেছিল, 'খনিতে সব থেকে বিপজ্জনক হচ্ছে মাথার ওপরের এই চাঙড়গুলো যা ঝুলছে কিন্তু ভেঙে পড়ছে না। কেননা যে কোন সময়েই সেগুলো ভেঙে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই আমরা—' একটু হেসে বলেছিল বিভাস, 'যা ভেঙে পড়তে চাইছে, কিন্তু নিজে থেকে ভাঙছে না— তাকে ভেঙে দিই।' সত্যি, কথা কি করে বলতে হয়, সেটা জানত বিভাস। খনি-বাস্তবতার পাশাপাশি মানুষে - মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা ভেঙে পড়তে চাইছে তা আগে বাড়িয়ে নিজ হাতে ভেঙে দেব— এটা বোধহয় ঠিক বলা হল না। কারণ বিভাস তো শুধু মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার নয়, ও তো একজন চলচ্চিত্রকারও হতে চেয়েছিল। ঠিক আছে, হয়ত চলে-যাওয়া মানুষ - মানুষীর দল ওকে পাগল করে যাক, সেটা ও চায় না, কিন্তু মানুষের জীবনে কেউ একজন থাকা দরকার যাকে সে বলতে পারে — তুমি যেও না।

অমিয়ও যে বিভাসের কথাটা এনজয় করেছে, সেটা পরে স্বীকার করেছিল। কিন্তু মজাটা হচ্ছে, এই মস্তিষ্কে-ঝলমলে -আলো-ফেলা কথাটা যদি তরু বা অমিয়র মধ্যে কোন একজন তাদের লিটল ম্যাগাজিন 'বিষতীর' -এর সাপ্তাহিক আড্ডায় বলত, অন্যজনের অবধারিত প্রতিক্রিয়াটি হত— এটা কোথা থেকে মারলি? মানে মার্কেজ না কুন্দোরা? বোর্হেস না হেনরি মিলার? কার লেখা থেকে? যদিও তারা দুজনেই জানে, সেই অর্থে সূর্যের নীচে কিছুই মৌলিক নয়— মানে বিষয়বস্তুর দিক থেকে চলে গেছে।'

মন্টি আর রুম, তরুর দু ভাইঝি। একজনের বয়স ২১ অন্যজনের ১৬। রুম তরুর ছেলে আকাশের চেয়ে মাস ছয়েকের ছোট। মন্টি ব্যাংগালোরের একটা প্রাইভেট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে। কলেজটা শহরের আউটস্কার্টে। প্রথম বছর দেড়েকও ও কলেজ হোস্টেলেই ছিল। কয়েক মাস আগে ব্যাংগালোর শহরে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে চলে আসে কলেজ হোস্টেল ছেড়ে। প্রথম মাসদুয়েক মন্টি থাকত ওর ক্লাসমেট ঝিলামের সংগে। তারপর ঝিলাম ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ ছেড়ে ফ্যাশন টেকনোলজি পড়তে দিল্লী চলে গেলে ও একাই থাকত। ১০/১২ দিনের ছুটিতে কলকাতা এসেছিল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ওর ব্যাংগালোর ফিরে যাবার প্লেনের টিকিট কাটা ছিল। কলকাতায় এসে একদিন তরুর সংগে ফোনে কথাও বলেছে।

'চলে গেছে? চলে গেছে মানে কি?'

হীরক আক্ষরিক অর্থেই তখন পথে বসে। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে সে ফোন করেছে তরুকে। সন্ধ্যে প্রায় আটটা বাজে। তার সংগে তখন বৌ মিঠু ও আই. সি. এইচ. (ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্থ)-এর কর্মচারী সোমনাথ। হীরকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও । হীরক চাইল্ড স্পেশালিস্ট ও আই. এ. পি. (ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পোডিয়াট্রিক্স) -র একজন মাথা। আই. এ. পি. সূত্রে গোটা কলকাতার শিশু চিকিৎসক মহলে বিপুল পরিচিতি হীরকের। এখন তার সংগে শুধু সোমনাথ। আর কারোকে একথা জানাতে পারে নি সে। কি করেই বা জানাবে।

'শুধু নিজেরা যায় নি। যাবার সময় বাড়ির সব গয়নাগাঁটি— পুরোটাই বাড়ির স্টিল আলমারিতে ছিল, প্রায় আড়াই-তিন লাখ টাকার, ক্যাশ টাকা ছিল প্রায় ৩০ হাজারের মত— আমার পেশেন্টদের ভ্যাকসিন কেনার টাকা, আমার অন্য চোখটা অপারেশনের টাকা, ভাইয়ের ট্রিটমেন্টের জন্য যে ৭ হাজার টাকা দিয়ে গেসলি, সব— সব নিয়ে গেছে।' হীরক ফোনে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই জিগেস করে মিঠুকে, 'টেপটাও কি নিয়ে গেছে?' মিঠু সম্ভবত কনফার্ম করতে পারে না সেটা। 'দুটো ঢাউস ব্যাগে নিজেদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে, রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে দুটো পুতুল কিনেছিল রুম— সেটাও রেখে যায় নি।'

ওহ্, খালি জিনিসপত্র আর জিনিসপত্র! হীরক ও মিঠুর এই এক বাতিক হয়েছে গত কয়েক বছর, যার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না তরু। এই বিপদের সময় টেপ রেকর্ডার, রাজস্থানী পুতুল এসব কথাবার্তা কে শুনতে চায়? আর অতগুলো টাকা বাড়ীতে রাখার যদি বা কোন কারণ থাকে, এত গয়না বাড়ীতে রাখা কেন? কলকাতার ব্যাংকগুলো লকারে গয়না রাখা বন্ধ করে দিয়েছে না কী? স্টেশনের মাইকে ট্রেন ছাড়া-সংক্রান্ত ঘোষণা শোনা যায় ফোনে, 'তোরা হাওড়া স্টেশনে কেন গেলি?'

'একটা চিঠি রেখে গেছে বাড়িতে। ওরা দেরাদুনে যাচ্ছে। হাওড়া - দিল্লী রাজধানী করে প্রথমে দিল্লী যাবে। ওখান থেকে দেরাদুন।'

'দেরাদুন কেন? ওখানে কি?'

'জানি না। লিখেছে দেরাদুনেই না কি গত মাস দুয়েক আছে। অথচ মন্টি এবার কলকাতায় আসার আগে অবধি ওর ফ্ল্যাটের টাটা ইন্ডিকম ফোনটায় মিঠু ওর সংগে কথা বলেছে। চিঠিতে লিখেছে, মিথ্যে কথা বলে বলে আমরা ক্লান্ত। কলকাতায় শান্তি পাই নি। ব্যাংগালোরেও না; দেরাদুন ছোট শহর, সেখানে গিয়ে খুব শান্তিতে আছি। আমাকে এরা মা-মেয়ে কিছুদুই জানায় নি, রুমকে নিয়ে গিয়ে পড়াবে দেরাদুনে। ওকে ক্লাস টেনে ভর্তি করে দেবে। একবছর পর রুমকে ফেরৎ দিয়ে যাবে। নিজে আর আসবে না। আমরা জীবনকে কন্ট্রোল করি না, জীবনই আমাদের কন্ট্রোল করে।' তরু বুঝতে পারে শেষ লাইনটা হিট হিন্দি ফিল্ম 'রং দে বাসন্তী' -র ডায়লগ। 'আর কিছুটা মন্টিরই হাতের লেখা। কিন্তু রুমের ভার্সানে, আমার কলকাতায় মুখ দেখাবার উপায় ছিল না, আমি সুইসাইডাল হয়ে যেতাম ওখানে থাকলে। শেষটা আবার মন্টিরই ভার্সান, মানুষ হয়ে টাকা রোজগার করতে পারলে তোমাদের জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেব। একটু কষ্ট করে

এখন চালিয়ে নিও। বাবি মা তোমরা আমাদের ভগবান। তোমাদের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি— এইসব। মিঠুর সংগে কথা বল।'

বৌদি ফোন ধরে শুধু কেঁদে চলে। 'শোনো, প্ল্যাটফর্মে বসে থেকে তো কোন লাভ নেই, আগে বাড়ি যাও, বাড়ি গিয়ে ঠিক কর— কি করা উচিত। আমি কাল সকালের ট্রেনেই আসছি।'

'না, যতক্ষণ ওরা না ফেরে আমি যাবো না। আমায় মন্টি ফোনে বলেছে ওরা বর্ধমানে নেমে ট্রেন ধরে ফেরৎ আসবে', মিঠু কাঁদতে থাকে। ফোনে এরপর সোমনাথের গলা শোনা যায়, 'তরুদা, দাদা এর মধ্যে একবার ঘুরে পড়ে গেছে প্ল্যাটফর্মে।' এই ৫৩ বছর বয়েসেই হীরকের হাই ব্লাড সুগার, একটা কিডনিও স্লাইটলি অ্যাফেক্টেড, পা দুটো ফোলে ব্লাড সুগার বাড়লেই। ব্লাড সুগার থেকে বাঁ চোখে একটা হেমারেজ হয়েছিল কয়েক মাস আগে, লেজার করিয়েও লাভ হয় নি। দুটো চোখেই ক্যাটার‍্যাক্ট। সপ্তা তিনেক আগে বাঁ-চোখে ফেকো করিয়েছে, তখন তরুরা গিয়েছিল কলকাতা অপারেশনের পর বাঁ চোখটায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। এত টেনশন কান্নাকাটি এসবের ফলে আবার চোখটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে, তরু সোমনাথকে বলে, 'বর্ধমানে রাজধানী থামে না। আপনি যে করে হোক ওদের বাড়ি নিয়ে যান।'

২। আমার টিকিট কাটা অনেক দূরে, এ গাড়ী যাবে না, আমি অন্য গাড়ী নেবো

বাড়ীতে ফোন এলে সাধারণ পোলো বা আকাশই ধরে, আমার অফিস সংক্রান্ত কয়েকটার কথা বাদ দিলে ফোন ওদেরই আসে বেশি। ইদানীং আমার বৌদি বা মন্টি- রুমদের ফোন এলেও দেখেছি ওরাও আমায় আর চায় না, পোলো বা আকাশকেই চায়। পয়লা ডিসেম্বর অন্যরকম হল। মন্টির ফোনটা আকাশই ধরেছিল, দিদির সঙ্গে কথা হবার পর বলল, 'দিদিভাই তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

মন্টি বলল, ২৩শে ডিসেম্বর ওরা ওদের বাবার ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে একটা স্যুভেনির বার করবে। ওরা ছোটরা মানে মন্টি, রুম, আকাশ এরা সবাই ওদের বাবা / জেঠু সম্পর্কে লিখবে এবং আমাকেও একটা লেখা দিতে হবে।

'তো, স্যুভেনির ছাপাবার বন্দোবস্ত কে করবে?'

'কেন, সোমনাথ কাকা।' সোমনাথ আই. সি. এইচ. ও আই. এ. পি. -র সব মেডিকেল জার্নাল ও স্যুভেনিরের ডেক্স টপ পাবলিশিং, ই-মেল দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদি কম্পিউটার সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করে। আই. সি.এইচ. -এ ওর এই চাকরীটা দাদার সুপারিশেই। চাকরীটার অলিখিত শর্ত হল ও দাদার পি. এ. -র কাজও করবে।

'আমি কেন, তোরা তো লিখছিস?' আমার এরকম একটা প্রশ্ন গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে মন্টি বলে, 'শোনো, ব্যাপারটা সিক্রেট, বাবাকে এটা একটা সারপ্রাইজ দিতে চাইছি, তোমার আর আকাশের লেখাটা শনিবারে ক্যুরিয়ারে পাঠিয়ে দিয়ো। খামে আমার নাম লিখবে। বাবার নাম লিখো না, তাহলে বাবা খুলে ফেলবে।'

মন্টিকে কি কখনো বলেছি, ফোন রেখে ভাবি আমি, যে ওর বাবার জন্মদিন আমরা সেলিব্রেট করতুম শান্তিনিকেতনে, 'কণ্ঠস্বর' লিটল ম্যাগাজিনের অস্থায়ী ক্যাম্পে? উদ্যোগটা প্রতিবারই নিতেন শ্রীমতি শুক্লা মজুমদার, যাঁকে আমরা ছোট বড় সবাই মাসিমা বললুম। ওর ডাক্তারী ও আমার ইঞ্জিনীয়ারীং পড়ার সময় জুড়ে মানে ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮০-৮১ যাকে আমাদের কলেজ জীবন বলা যায়, অধিকাংশ বছরেই ঐ ৭ই পৌষ আমরা, কণ্ঠস্বর পত্রিকার গোটা ব্যাচ, পৌষমেলা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে থাকতুম। ১৯৬৯ -এ ডাক্তারী পড়তে ভর্তি হলেও নকসাল আমলে বছরের পর বছর পরীক্ষা পেছোনোর জন্য ফুলফ্লেজেড ডাক্তার হতে দাদাকে ১৯৭৯ অবধি অপেক্ষা করতে হয়। এখন যেমন আই. এ. পি. -র বিভিন্ন কর্মকান্ডের পেছনের প্রধান উদ্যোগী ও, সে সময় ও ছিল লিটল ম্যাগাজিনের অ্যাকটিভিস্ট। এখন যেমন সারা বছর জুড়েই তালতলার বাড়ীতে আই. এ. পি.-র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তোরজোড় চলে, সোমনাথ মেডিকেল জার্নাল বা পাবলিকেশনের প্রুফ নিয়ে যাতায়াত করে, তখনও সারা বছর জুড়ে 'কণ্ঠস্বর', 'কবিসেনা' ও 'প্রকল্পনা সাহিত্য', তিনটে লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ, তাদের বিভিন্ন সংখ্যার প্রুফ দেখার কর্মচাঞ্চল্যে উষ্ণ হয়ে থাকত আমাদের বাড়ি। লিটল ম্যাগাজিনগুলোর কর্মকাণ্ড ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। পৌষমেলা, বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব বা কলকাতা আর্ট ফেয়ারে পত্রিকার স্টল দেওয়া হত নিয়মিত। তখনও কলকাতা বইমেলা শুরু হয় নি। পত্রিকার স্টলের সামনে কবিতা পাঠ ও বিপুল হৈ চৈ ছাড়াও মধ্য কলকাতার কুমার সিং হলে নিয়মিত কবি সম্মেলন ও সাহিত্য আসর হত। পঁচিশে বৈশাখের সকালে জোড়াসাঁকো - রবীন্দ্রসদনে ও দোলের সকালে শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে ঘাড়ে করে পত্রিকা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জোব চার্ণকের জন্মদিনে তাঁদের সমাধিদুটির পাশে কবিতাপাঠ— সব কিছুর পিছনের ড্রাইভিং ফোর্স ছিল দাদা। ওকে কলকাতার কবি শিল্পীরা লিটল ম্যাগাজিনের অ্যাকটিভিস্ট হিসেবেই জানত। ও যে ডাক্তারী ছাত্র সে কথা জেনেছে ঢের পরে।

সেই লিটল ম্যাগাজিনগুলি, হায়, ওর সযত্ন লালন না পাওয়ায়, আর সেরকম ভাইব্রান্ট নেই— যাদের কর্মকাণ্ডকে ওর ইনোভেটিভ লিডারশিপ একাট আনন্দময় উৎসবের রূপ দিয়েছিল। দাদা এরকম, আমরা যে 'যেনাহং নামৃতা স্যাম কিম অহং তেন কুর্য্যাম' বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকি, ও সেই বসে থাকার দলে নেই। ও যেটা নিয়ে যখন মাতে, সেটার মহত্ত্ব বা স্থায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের প্রবল এনার্জি একটার পর একটা এরকম প্রবল উদ্যোগের দিকে টেনে নিয়ে যায় ওকে।

শুধু দাদার সংঙ্গে প্রথম যৌবনটা একসংগে হৈ হৈ করে কাটানোর দরুন আমি বুঝতে পারি, জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে এক দীর্ঘ বর্ণময় উৎসব। হ্যাঁ, দুঃখ, মৃত্যু এসব তো আছেই, এইসব হাতুড়ির ঘা -ও আমরা একসংগে খেয়েছি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও বারবার মনে হয়েছে, একটা লম্বা জার্নির টিকিট রাখা আছে আমার বুক পকেটে।

এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন নেই, এখনও আমাদের পূজোর ও পারিবারিক উৎসবের দিনগুলো ওরই ছোঁয়ায় বর্ণময় হয়ে ওঠে, আদারওয়াইজ যা বছরের আর পাঁচটা দিনের মত ম্যাড়মেড়ে হত।

ওর দোষ কিছু কি দেখেছি কখনো? —জিগেস করলে অবশ্য আমায় বলতেই হবে 'ইনকন্‌সিস্‌টেনসি।' নিজের প্রবল এনার্জি যখন নতুন কোনো উদ্যোগের দিকে টেনে নিয়ে যায় ওকে, পূর্ববর্তী উদ্যোগটিকে ও তখন অবলীলায় ভুলে যায়। এখন এটা যেহেতু সমালোচনা হিসেবেই বলা, এ বিষয়ে আমায় একটু বিস্তারিত হতে হবে। 'দ্য পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' প্রথমবার পড়ে আমার মনে হয়েছিল এর চেয়ে ভালো লেখা অসম্ভব। কাজেই অস্কার ওয়াইল্ডের সেই অনন্য এপিগ্রামটা আমার জানা আছে : কন্‌সিস্‌টেনসি ইজ দি অ্যাট্রিবিউট অফ দি ইডিয়ট। কিন্তু এখানে আমি কন্‌সিস্‌টেনসি বলতে চিন্তা বা আচরণে সামঞ্জস্য বোঝাতে চাইছি না, আমি বোঝাতে চাইছি স্মৃতির সামঞ্জস্য। এক জন্মে স্মৃতি যেন অখণ্ড থাকে সেটা লক্ষ্য রাখা। হয় কি, অর্থনৈতিক ভাবে একটু ওপরে-নীচে থাকা শ্রেণীগুলোর মধ্যে তো

সত্যি কোনি আয়রণ কার্টেন নেই। গরীব থেকে নিম্নবিত্ত থেকে স্বচ্ছল থেকে ডলার পাউন্ডে উচ্ছল উচ্চবিত্ত— এই আরোহন পর্বে নিজের অতীত অবস্থানটা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। দাদা ও অমিয় জানে আমার এই মনোভাব। দাদা বলে, 'তরু ভীষণ মধ্যবিত্ত।' আর অমিয় এটাকে 'দারিদ্রের অহংকার' বলে লেগপুলিং করে— যদিও আমি জানি দুজনেই ভুল। সন্দীপন তাঁর প্রথমদিকের লেখায় একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যেটাকে আমি নিজের চোখের সামনে সর্বদা রাখি, অবশ্য একটু বেঁকিয়ে : এই কি একটা ভালো ছাত্রের সাফল্য, বড়লোকশ্রেণীর সংগে এই মিশে যাওয়া? একটা লম্বা জার্নির টিকিট রাখা আছে ওর বুক পকেটে, এটা দাদা মনে রাখে নি। ওর ইন্‌কন্‌সিস্‌টেনসি বলতে আমি এটাই বোঝাতে চাইছি। এত জীবনানন্দের কবিতা পড়ত ও — সব ভুলে গেল কি করে

অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিল কেউ কেউ
ছোট বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড়; —
সেইখানে বই পড়া হত কিছু— লেখা হত;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
বেড়ীর আলোর মত কী যেন এমন এক আশাবাদী ছিল
তাহাদের চোখে মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায়;
সংসারে সমাজে দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হলে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড়;

এসব কি করে ভোলে কেউ? ভোলা যায়? ওকে দেখে আমার আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় শয়তানের যে অনুচর এক হাতে মানুষকে সাফল্যের টিকিটটা দ্যায়, অন্য হাতে সে-ই মূল জীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দ্যায় তাকে। মানুষের উচিত শয়তানের অনুচরকে তার টিকিটটা ফেরৎ দেওয়া এবং বিনীতভাবে তাকে জানানো, 'ভাই এ— টিকিটে আমার হবে না। আমি একটু দূরে যেতে চাই।'

৩। রাজধানী এক্সপ্রেসে এখন মধ্যযামিনী

হীরক ও মিঠুকে নিয়ে সোমনাথ হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়েছে জেনে তরু বরানগরে তার বন্ধু হায়দারের বাড়িতে ফোন করে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। প্রথমবার ফোন করতে হায়দারের বৌ তিন্নী জানায়, 'ও তো একটু বেরিয়েছে। তরুদা, তুমি আধঘন্টা পরে ফোন করবে?' হায়দার রাজভবনের এসপ্ল্যানেড ইস্ট -এর দিকের গেটটায় উল্টোফুটে রেলের পি.আর. ওঃ - তে কাজ করে। হায়দারেরও তরুর মত মোবাইল নেই।

হায়দার অমিয়র বাল্যবন্ধু, দুজনেই সিউড়ির ছেলে। অমিয়র সূত্রেই হায়দারের সঙ্গে আলাপ তরুর। তবে শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় হৈ হৈ বাবদ হীরককে ওরা চিনত আগে থেকেই। সিউড়ি থেকে বোলপুর আর কত দূর। পৌষমেলায় অমিয়রা নিয়মিতই যেত। তরু ও হীরকের মত তখন ওরা দুজনেও কবিতা লিখত। এখন অমিয় পুরোদস্তুর গদ্যকার। হায়দারও 'বিষতীর' -এর জন্য হেনরী মিলার, চমস্কি - প্রমুখের অনুবাদ করে দিয়েছে তরু - অমিয়র চাপে পড়ে। সংক্ষেপে বলার— তরু যে এখনও গেঁজে যায় নি তাতে গ্রন্থনিচয় ও চলচ্চিত্রসমূহের সংগে এদেরও কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে, বিশেষত অমিয়র।

'বলো, তরু, ফোন করছিলে?' সব শুনে হায়দার বলে, 'দেখো তরু, স্ক্যান্ডালই হোক আর যাই হোক জি. আর. পি. (গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ)-তে কমপ্লেন লজ করা ছাড়া তো তোমাদের উপায় নেই। ট্রেনে থাকতে থাকতেই তো ওদের ট্র্যাক্ করতে হবে। একবার ট্রেন থেকে নেবে মানুষের ভিড়ে মিশে গেলে জীবনে ওদের ট্রেসই পাবে না আর। অধীর আছে আসানসোলে, তুমি ওর কাছে যাও। ওর নাম্বার আছে আমার কাছে, ধর দিচ্ছি।' অধীর আসানসোলেরই ছেলে, আসানসোল স্টেশনের লবি অফিসে কাজ করে। এক সময় বিষতীরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। থাকে আসানসোলের ইসমাইলে— তরুদের কলোনী থেকে মোটরবাইকে প্রায় আধঘন্টার রাস্তা। 'অধীরকে নিয়ে তুমি আসানসোল স্টেশনে যাও। তুমি একা গেলে জি. আর. পি. হয়ত এফ. আই. আর. নিতে চাইবে না।'

অধীরকে ফোন করে তরু ডিটেল্‌সে জানায় সবকিছু। অধীর বলে, 'কেন, প্রায়ো কিছু করতে পারলো না? তুমি এসো, আমি খোঁজ নিচ্ছি রাজধানীতে আর কনডাকটর কে আছে।' মন রসিকতা উপভোগ করার মত অবস্থায় নেই তবু তরু বোঝে অধীর 'প্রায়ো' বলতে রেলের পি. আর.ও. —তে কাজ করা হায়দারকে বোঝাতে চাইছে।

পোলো বলে, 'কিছু খেয়ে বেরোও।'

'এখন খাওয়ার ইচ্ছে নেই।'

অধীরের বাড়ী যখন পৌঁছোল তরু, তখন রাত প্রায় ১১টা। অধীরের তখনও খাওয়াদাওয়া হয় নি। ততক্ষণে ও হাওড়া - দিল্লী রাজধানীর কনডাকটর রাহুল ব্যানার্জীর মোবাইলের নাম্বার জোগাড় করে ফেলেছে। রাহুলকে ফোনে ধরে মন্টি ও রুমের ডিটেল্‌স্ দিয়ে প্যাসেঞ্জার লিস্ট থেকে এরকম কেউ আছে কিনা যারা হাওয়া থেকে স্পট রিজার্ভেশন করিয়েছে সেটা দেখতেও বলে দিয়েছে। 'এসব হুইমজিকাল কেসে তো আগে থেকে রিজার্ভেশন থাকবে না আর রিজার্ভেশন ছাড়া রাজধানীতে চড়া যাবে না— তাই স্পট রিজার্ভেশনের কথাটা মাথায় এল' — জানায় অধীর। কিছুক্ষণ পর অধীরের মোবাইলে রাহুল ব্যানার্জী একটা মিস্‌ড্ কল দিল। রাহুলকে ফোনে ধরতে ও জানালো, 'এরকম দুটো মেয়ে আছে ট্রেনে, কিন্তু বড়জন বয়স লিখিয়েছে ২৫। মেয়েদুটির পদবী সিং। ওদের সঙ্গে দুটি ছেলেও আছে। কিন্তু রাজধানীর প্যাসেঞ্জার, এরা নিজেরা না হলেও এদের বাবা -টাবারা ইনফ্লুয়েনসিয়াল হয়। তুমি মোগলসরাই স্টেশন -এর জি. আর. পি. - কে মবিলাইজ করো। আমি মোগলসরাই অবধি ওদের চোখে চোখে রাখছি।'

অধীর রাতের খাবার খেয়ে জামাপ্যান্ট পরে নেয়। নিজের মোটর বাইকে অধীরকে চাপিয়ে আসানসোল স্টেশন যাবার পথে একটা পি. সি. ও. বুথ থেকে তরু হীরককে ফোন করে। রাহুল ব্যানার্জীর মোবাইল নাম্বার, মেয়েদুটোর কোচ নাম্বার, নাম ও বয়স জানায়

হীরকের কাছে শোনে, তালতলার বাড়ির ডাঃ হিমানীশ বিশ্বাস এসেছে। হিমানীশ কলকাতার ডাক্তারদের মধ্যে যাকে বলে টপ সিড। খুবই ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক। হিন্দু স্কুলের ছাত্র, হায়ার সেকেন্ডারীতে ফার্স্ট হয়েছিল। নানা কারণে হীরকের সংগে ওর খুবই অন্তরংগতা। হিমাণীশের পেসেন্ট। ডি. সি. ডি. ডি. -র কথামত ইন্টারনেটে মন্টি ও রুমের ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নিউ দিল্লী স্টেশনে। দিল্লী পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে।

আসানসোল স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে জি. আর. পি. অফিসের ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ অফিসারটি ফোনে মোগলসরাই স্টেশনের জি. আর. পি. -কে বলেন, 'দেখুন যদি এটা কনফার্ম হওয়া যায় যে এই দুটো মেয়ে নাম ও বয়েস ভাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ওদের মোগলসরাই -এ আটকাবার ব্যবস্থা করুন।' বলে উনি অধীর ও তরুর দিকে চেয়ে হাসেন, 'মোগলসরাইয়ে আটকাতে পারলেই ওদের খেলা শেষ এটা ভাববেন না। বড়মেয়েটি অ্যাডাল্ট, ওকে কিছু করা যাবে না। এরকম ঘটনা ঘটেছে— দুর্গাপুরের মেয়ে, প্রেমিকের সংগে পালাচ্ছে, আমরা খবর পেয়ে ট্রেন থেকে নামিয়েছি আসানসোলে, কিন্তু সে মেয়ে অ্যাডামেন্ট— বাবা এসেও তাকে কিছু করতে পারল না। বড়মেয়েটিকে কিছু করা যাবে না, কিন্তু ছোটটি তো মাইনর— তাকে আটকানো যাবে।'

অধীর তরুর দিকে তাকায়, তার মুখেও হাসি, 'ওদের ধরা গেলে খেলা শেষ না হোক, খেলাটা ১-১ হয়েছে, এটা অন্তত বলা যাবে।'

তখনও রাজধানীর মোগলসরাইয়ে পৌঁছোতে দেরী আছে। তরু জি. আর. পি. অফিস থেকে শুনশান ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বেরোয়। পি. সি.ও. বুথের ঘুমন্ত লোকটাকে তুলে হীরককে আবার ফোন করে। হীরক বলল, 'না ওরা নয়। হিমানীশ রাহুল ব্যানার্জীকে ফোন করেছিল। রাহুল ব্যানার্জী ভয় পাচ্ছিল, বলল আমার চাকরী চলে যাবে। হিমানীশ বলেছে, কিছু হলে আমরা আপনার পুরো প্রোকেটশন দেবো। রাহুল ব্যানার্জী সংগে কয়েকজনকে নিয়ে গিয়ে ওদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে মোবাইলে আমার সংগে কথা বলিয়েছে। গলা আলাদা— ওরা নয়। রাহুলের সংগে রেলের যারা ছিল তাদের একজন ফোনে বলল ছুটকি যো হ্যায় ও পাতলি (রোগা) হ্যায়।'

মন্টি রুম দুজনেই ফ্ল্যাবি। অধীরকে মোটরবাইকে ও বাড়িতে ড্রপ করে রাত দেড়টার শূন্য ধূ ধূ রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে জি আর পি অফিসে বলা অধীরের কথাগুলো মনে পড়ে তরুর। সে নিজের মনেই ক্র্যাশ হেলমেট সমেত মাথাটা নাড়ে, নাঃ খেলাটায় স্কোর ১-০ রয়ে গেল। ১-১ করা গেল না।

৪। মাটির প্রদীপ ও সন্ধ্যারবি

১৯৮২ তে যখন হীরক - মিঠুর বিয়ে হয়, অন্য দুই কাকা তাদের ঠাকুমাকে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে চলে গেলেও তখন এই বাড়ীতে তরুর মা থাকত, তরুর ছোট কাকা ও কাকীমা থাকত। তিনটে ঘরওলা বাড়ী, কোনের ছোট ঘর— যেটা এখন তরুর ভাইঝিদের এবং তরু ও পোলো একসংগে তালতলায় গেলে তাদের, সেটায় থাকত কাকা কাকীমা। মাঝের মাঝারী আকারের ঘরটায় হীরক - মিঠু ও বড় সদর ঘরটায় তরুর মা। তাদের ছোটভাই তখনও জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে পড়ে আর তরু সদ্য ইঞ্জিনীয়ারীং পাশ করে রাউরকেলায় চাকরী করে। ছুটিতে বাড়ী এলে তারা সদর ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে শুত। তখনও বেশ ক্লামজি অবস্থা তালতলা বাড়ীর। খুব জলাভাবও ছিল, রাস্তার কলে জল ধরতে হত, বাড়ীর কলে যথেষ্ট জল আসত না বলে। মানে এখন হীরকের স্বাচ্ছল্য বাড়ীটাকে যেমন ঝাঁ - চকচকে করে তুলেছে, বাড়ীতে জলের পাম্প ও ছাদের ওপর নিজস্ব জলের ট্যাংক সমেত, তখন এরকম ছিল না। অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজে ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ারের সংগে সাধারণত সমাজের যে অর্থনৈতিক স্তরের মেয়েদের বিয়ে হয়— সে শ্রেণীর মেয়ে হলে এবং বাড়ীটার লোকেশন কলকাতার ওরকম একটা প্রাইম জায়গায় না হলে যে দুদিনও এই বাড়ীতে থাকতে রাজী হত না মিঠু, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়। ঐ প্রচুর ভাইবোন সমেত নিম্নমধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে না এলে; যতই প্রেমের বিয়ে হোক, এই স্ট্রাগলটা করতে মিঠুকে রাজি করানো যেত কি? মনে হয় না। বিশেষত নিজে চাকরী করে।

তরু দেখেছে, ডাক্তারী পেশায়, মানে যারা ডাক্তারের চাকরী করে তারা নয়, যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে, এরকম প্রাথমিক স্ট্রাগলের পর যখন তারা প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে, হঠাৎ করেই তারা বড়লোক হতে শুরু করে। মরা নদীর সোঁতায় বান আসার মত তারা ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে টাকাকড়িতে। লাফিয়ে লাফিয়ে বছর বছর তারা নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে স্বচ্ছল থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকায় উচ্ছ্বল বড়লোক হয়ে যায়। একটা শর্ট স্প্যানের মধ্যে পাখিদের মত পাখা বিনা অতদূর চলে যাওয়ার অভিঘাত সামলাতে পারে না হীরকের মত অনেকেই।

না, এ কোনো 'ফিলজফি অফ ডিপ্রাইভ্ড্' তথা 'বঞ্চিতের দর্শন' নয়। তরু চাকরীজীবি মানুষ এবং সুযোগ থাকা সত্বেও ঘুষটুষ নেয় না বলে তার উপার্জন সীমিত, কিন্তু অপ্রতুল নয়। এস. বি. আই. -এর হাউসিং লোনে কেনা ৫০০ স্কোয়ার ফুটের একটা লিলিপুটাকৃতির ফ্ল্যাট তথা কোম্পানীর কার লোনে কেনা একটা জগদ্দল তারও আছে। মধ্যে বি জে পি আমলে তাদের ইউনিটটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। তখন তরুদের গ্রেড রিভিশন ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের মূল সংকট ছিল নিরাপত্তাহীনতার, অর্থাভাবের নয়। আর অন্য কেউ না জানুক তরু নিজে জানে, হীরকের সংগে তার সম্পর্কটা শুধু দাদা ভাইয়ের নয়, অনেক লড়াই ও অনেক ফূর্তি একসঙ্গে করা সহযোদ্ধার। হীরকের কৃতিত্বে সে যে বরাবর গর্ব বোধ করেছে সেটা এই কমরেডশিপের জায়গাটা থেকেই । কাজেই তরুর এই ধারণাটা কোন মাৎসর্যজনিত নয়, যে মরা গাঙে বান এলেই সবাই 'জয় মা' বলে তরী ভাসাতে পারে না। অন্তত হীরক নিজের এই সমৃদ্ধিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না, এ তরু তখনই বুঝেছিল।

উদাহরণস্বরূপ এখানে পার্কসার্কাস পূজো প্যাণ্ডেলের সামনের রাস্তায় হীরকের গাড়ী পার্ক করাটাকে পেশ করা যায়। সেটা সম্ভবত ১৯৯০ বা ৯১, আর সম্ভবত কেন নিশ্চিত অষ্টমীর সকাল। কারণ দুর্গাপূজোর কোনদিন কোথায় ঠাকুর দেখতে যাবে সেটা হীরক রিচ্যুয়ালের মত পালন করে। অষ্টমীর সকালে তারা পার্কসার্কাসে ঠাকুর দেখতে যায় যেমন দশমীর সকালে যায় বাগবাজার পূজো প্যাণ্ডেলে সিঁদুরখেলা দেখতে। রিচ্যুয়াল মানার কারণটা অদ্ভুত। কলকাতার অ্যারিস্টোক্রাটরা নাকি এটাই করে। অ্যারিস্টোক্র্যাটরা করে তো আমরা করব কেন, আমরা তো অনভিজাত তথা আন্ডারডগ? এ প্রশ্ন অবশ্য তরু কোনদিন করে নি। হীরক তরুর মত নিজেকে আন্ডারডগ ভাবে নি কোনোদিন। তাদের বাবা এ. জি. বেংগল -এর সেকসন অফিসার ছিলেন। ১৯৭২ সালে, হার্ট অ্যাটাকে তাঁর অকালমৃত্যুতে তাদের পরিবার একটা নিরাপত্তাহীনতা তথা অর্থাভাবের গাড্ডায় পড়ে। তখন হীরক ডাক্তারীর তৃতীয় বর্ষের ও তরু ক্লাস এইটের ছাত্র, তাদের ছোটভাই প্রায় শিশু। তার মা সুদূর অতীতে একটা আই এ পাশ করলেও, ১০০ শতাংশ গৃহবধূই ছিলেন। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে পাওয়া চাকরীটা তিনি করতে না পারলে ঐ গাড্ডা থেকে তারা আর বেরোতে পারত না। অন্তত ডাক্তারী পড়া ছেড়ের হীরককে যে এ. জি. বেংগল-এর ক্লার্ক হতে হত এ বলাই যায়। এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রবল বির বাসে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত, হাওড়া গার্লস কলেজপর্বের পর ১৮/১৯ বছর ছেলেদের পড়ানো ছাড়া অন্য কোনোরকম পড়াশোনার সংস্পর্শে না থাকা, এরকম হাজারটা কারণ ছিল এই ভেঞ্চারে তাদের মায়ের না ঝাঁপাতে পারার।

হীরকের ডাক্তার হওয়াটা ছিল তার বাবার একটা স্বপ্ন, যেটা বাস্তবায়িত হবার আগে তিনি মারা যান। মাটির প্রদীপ-টি তাই, 'কে লইবে মোর কার্য' ভেবে কাজ সমাপ্ত করে যেতে না - পারার জন্য উদ্বিগ্ন সন্ধ্যারবি-কে জানিয়েছিল 'স্বামী, আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।' আদারওয়াইজ তাদের বড়লোক মামাবাবু, যথাক্রমে শ'ওয়ালেশও রাইটার্স বিল্ডিং-এ ভাল চাকরী করা মেজকাকা ও তখন - অকৃতদার

সেজকাকা, মায় ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে নিজের যে বখে - যাওয়া ভাইকে তরুর বাবা এ. জি. বেংগল- এ চাকরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং যে তখনও তালতলায় তাদের সংগেই থাকত সেই ব্যাচেলর ছোটকাকা, তাদের এই পরিবারিক 'জগৎ' তো সন্ধ্যারবির প্রশ্নটিতে 'নিরুত্তর ছবি'-র মতই দাঁড়িয়েছিল তথা 'কর্তব্যগ্রহণ' করতে রাজি হয় নি। প্যাটিতে নিবেদিতপ্রাণ সি. পি. এম. করা রেলকর্মী তাদের আদর্শবাদী ছোটমামা অবশ্য একবার বলেছিলেন 'ছোড়দি কোনদিন একা বেরোয় নি বাড়ি থেকে, ও চাকরী করতে পারবে না। আমি হীরু - তরুর পড়াশোনার দায়িত্ব নিচ্ছি।' তাদের প্র্যাগমাটিক ও ধনী মামাবাবু এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন ভাইকে, 'পারবে না কেন? হাজার হাজার মহিলারা বাসে ট্রেনে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করছে— তালতলা থেকে ট্রেজারী বিল্ডিং কটা স্টপ?' তাদের বাবার অফিস হাইকোর্টের পুরোনো বিল্ডিংটার পাশে এবং রাজভবনের পেছনের গেটের উল্টোদিকে ট্রেজারী বিল্ডিংয়েই ছিল।

তো যে কথা হচ্ছিল, সম্ভবত ৯১ -এর নিশ্চিত অষ্টমীর ঝলমলে সকালে পার্কসার্কাস পূজো প্যাণ্ডেলের সামনের রাস্তাটা গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ, হীরক ততদিনে ভালো গাড়ী ড্রাইভ করতে শিখে গেছে; একটা ছোট ফাঁকা স্লটে নিপুণভাবে তার তৎকালীন সেকেন্ড হ্যান্ড প্রিমিয়ার পদ্মিনীটা পার্ক করে বলল, 'চেষ্টা থাকলে, ফাস্ট জেনারেশনেই পারা যায়।'

অর্থাৎ ঐ গাড়ী পার্ক করা! যা কলকাতার কয়েক হাজার টাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ীর ড্রাইভার প্রতিদিন একাধিক বার করে। এই 'ফার্স্ট জেনারেশন বড়লোক' কমপ্লেক্সটা কবে থেকে হল হীরকের?— যারপরনাই অবাক হয়ে ভেবেছিল তরু। আগের বছর পূজোর ঠিক পরে পরেই তাদের মা মারা গেছেন। মার ক্যানসার হয়েছিল। তরু না ভেবে পারে নি, মাটির প্রদীপটি যে টিমটিম আলো জ্বেলে অন্ধকার কাটিয়েছিল, হীরক তা প্রাণপণে ভুলতে চাইছে।

৫। অপরাধের একটি নিখুঁত পরিকল্পনা ও তার ত্রুরটিহীন রূপায়ণ

দিনের প্রথম আসানসোল থেকে হাওড়া যাবার ট্রেন হল অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে তরুর প্রথম কাজ হল, স্টেশনের স্টেট ব্যাংকের এ.টি.এম থেকে ৮ হাটার টাকা তোলা। মন্টি - রুম আলমারী থেকে ওরকম ঝেড়ে পুঁছে সব টাকাপয়সা নিয়ে চলে গেছে দেখে এবং ক্রেডিট কার্ডদুটো সামনাসামনি খুঁজে না পেয়ে, আতংকগ্রস্ত হীরকের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াই হয়েছে ক্রেডিট কার্ডগুলো সিল করে দেওয়া, আজ রোববার, ব্যাংকও বন্ধ। এ অবস্থায় ওদের টাকাটা লাগতে পারে ভেবে তরু এ.টি.এম কার্ডটা সংগে নিয়েই এসেছিল। ভাইয়ের ট্রিটমেন্টের জন্য কোয়াপরেটিভ থেকে ১৫ হাজার টাকা লোন তুলেছিল, তার ৭ হাজার আগেই দিয়ে গেসল হীরককে। বাকি ৮ হাজার, হীরক বলেছিল প্রয়োজন হলে তরুকে জানাবে। এর ঠিক ৯ ঘন্টা পর তরু যখন ঐ এ.টি.এম. -এর পাশের টিকিট কাউন্টারের লাইনে ফেরার অগ্নিবাণী এক্সপ্রেসের টিকিট কিনতে দাঁড়ালো, তার মনে হচ্ছিল নিজের ধ্বংসস্তূপ বয়ে নিয়ে ফিরছে আসানসোল। তার চোখের সামনে তখনও হীরকের কান্নাভেজা মুখটা ভাসছে। হীরকের সেই শ্রান্ত পা ফেলে ফেলে মিঠুকে সংগে নিয়ে প্লেন ধরতে এয়ারপোর্টে ঢুকে যাওয়াটা। আসানসোলে ঘটনাহীন নিস্তরংগ এক জীবনযাপনে তরু অভ্যস্ত। আজকের ক্রাইম থ্রিলারের মত অজস্র ঘটনাপ্রবাহের খাপছাড়া উত্তেজনা সহ্য না হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

বাড়িতে মিসিং স্কোয়াডের তিনজন ডিকেটটিভ, যার মধ্যে একজন মহিলা। সোমনাথ জানায় মহিলার নাম দেবশ্রী, কলকাতা পুলিশের ডিকেটটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র অফিসার। প্রায়ই না কি ওকে টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম বিষয়ে মানুষের অদ্ভুত কৌতূহলের নিরসন করতে। ডাঃ হিমানীল বিশ্বাসের অনুরোধে ডি. সি. ডি. অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট জ্ঞানবন্ত সিং ওদের নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশের ভ্যান না নিয়ে সিভিল ড্রেসে আসতে। দেবশ্রী এসেছিল একটা আটপৌরে সালোয়ার কামিজ পরে, ওর মারুতী এস্টিমটা তরুদের গলির মোড়ে পার্ক করে রেখে। সংখ্যায় তিনজন অফিসার থাকলেও কাজের কাজ যা সব দেবশ্রীই করল। বাকি দুজন গোয়েন্দা অফিসারের একজন পুরোটা সময় এক নীরব দর্শকের ভূমিকায় ও অন্যজন বাচাল পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করে গেল দুজন দক্ষ অভিনেতার মত।

তরু যখন পৌঁছাল, বাড়িতে হীরক, মিঠু, দিনরাতের যে বাচ্চা ছেলেটি বাড়ীতে থাকে— কৈলাশ, এরা ছাড়া ছিল শুধু সোমনাথ। আর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপ, এধারে ওধারে বেস্ট বেকারী নিভে যাওয়া আগুন থেকে তখনও বেরোনো ধোঁয়া, করসেবকদের ফেলে যাওয়া গাঁইতি শাবল, হিন্দিতে জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা— এইসব। মিসিং স্কোয়াডের অফিসারেরা আসার আগে অবধি ওখানে আরো ছিল দীর্ঘশ্বাস ও কান্নার আওয়াজ।

জানা গেল গতকাল মিঠুর মর্ণিং শিফট ছিল। ডিউটি করে ফিরতে, মন্টি তাকে বলে, 'মা আমি সিস্টার এমারেল্ডার সংগে কথা বলে রেখেছি, উনি বলেছেন রুমকে ক্লাস টেনেই ভর্তি করে নেবেন, তুমি তাড়াতাড়ি কারমেলে গিয়ে সিস্টারের সংগে দ্যাখা করো।' সিস্টার এমারেল্ডা কারমেলের প্রিন্সিপাল, মন্টি কারমেলেই পড়াশোনা করেছে ক্লাস টেন অবধি, কারমেলের নানা অনুষ্ঠানে হীরক বিজ্ঞাপন তুলে দিয়ে বা অন্যভাবে সাহায্য করে থাকে বলে উনি মন্টিকে ভালই চেনেন।

রুম -এর ফেল করারর দুঃসংবাদটা মিঠু চেপে রেখেছিল, হীরককে জানায় নি। কাজেই মন্টি জানত, এটা এমন একটা টোপ—যা ওর মা খাবেই। এবং এটাই ছিল পরিকল্পনাটার একটা চূড়ান্ত মুহূর্ত যার ওপর নির্ভর করছিল পুরো পরিকল্পনাটার সাফল্য। মিঠু স্নানটুকু সেরে খাওয়া - দাওয়া না করেই কারমেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। আলমারির চাবি খুলে রুমকে রিঅ্যাডমিশন করানোর টাকা বার করে। টাকা নিয়ে চাবি লাগানোর সময় মন্টি বলে, 'চাবিটা রেখে যাও।'

'কেন?'

'আলমারিটা এত অগোছালো করে রাখো তুমি— আমি আর রুম আলমারিটা গুছিয়ে দিচ্ছি।' হেসে বলে, 'তুমি কি আমাদের অবিশ্বাস করো না কি?' ওর কথায় রুম, হায়, ১৬ বছরের রুমও হেসে উঠেছিল। এমন কি মিঠু গলায় যে সোনার চেনটা পড়েছিল, সেটাও দুই বোনে মিলে খোলায়, 'সোনা পরলে তোমার র‍্যাশ বেরোয়, ওটা পরে আছো কেন? খুলে রেখে যাও।' স্কুলের গেটের কাছে পৌঁছোতে মিঠুর যে সময় লাগে তাঁর মধ্যে দুজনে সবকিছু দুটো ব্যাগে গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কৈলাস ওদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে মন্টি বলে, 'আমরা দুজন সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি— ওখানেই থাকব কয়েকদিন।' সল্ট লেকের পূর্বাচল হাউসিং -এ হীরকের একটা ফ্ল্যাট আছে, তালাবন্ধই পড়ে থাকে। কিছুদিন আগে প্রচুর খরচ করে সেটাকে রেনোভেট করেছে হীরক। মাঝে মধ্যে ছুটি থাকলে ওরা ঐ ফ্ল্যাটে দুয়েকদিন থেকে আসে।

কারমেল স্কুলে ঢোকার মুখে মিঠু তার মোবাইলে মন্টির ফোন পায়, 'মা, তুমি চলে এসো, সিস্টার এমারেল্ডা বলে দিয়েছে আজ ব্যস্ত,

দেখা করতে পারবে না।'

'তুই কি করে জানলি সিস্টার দেখা করবে না?'

'আমি জানি, আর সিস্টারের সংগে দেখা করে তোমার কোন লাভও নেই। আমি রুমকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

অজানা আতংকে মিঠুর চলচ্ছক্তি নষ্ট হয়ে যায়— সে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তার মধ্যেই চিৎকার করে ওঠে, 'রুমকে নিয়ে চলে যাচ্ছিস? কোথায়?—'

'দেরাদুনে। হাওড়া থেকে রাজধানী ধরব।'

হীরকের মতে এই পুরো পরিকল্পানাটার মাস্টারমাইন্ড হীরকের বন্ধু ডাঃ প্রাণেশ মণ্ডলের ছেলে প্লাবন, দুটি পরিবারের মধ্যে বহুদিনের ঘনিষ্ঠতার সূত্রে মন্টি ও প্লাবন ছোটবেলা থেকে খুব ঘনিষ্ঠ। ঘনিষ্ঠতাটার বর্তমান চেহারা কি সেটা অবশ্য তরু আসানসোলে থাকার কারণে স্পষ্ট জানে না, কেননা নিজের মেয়েদের বিষয়ে মিঠুর ভূমিকাটা অদ্ভূত, কিছুই জানতে দেয় না কাউকে। এই ঘটনাটা এত চূড়ান্ত আকার ধারণ না করলে এবং হীরক আপসেট হয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে তরুকে ফোন করে না ফেললে, এটাও তাকে জানানো হত না এ বিষয়ে তরু নিশ্চিত। মিঠুর বোন সুমনার বিয়ে হয়েছে তরুর ব্যাচমেট চন্দ্রনাথের সংগে, ওরা দূর্গাপুরের ডি পি এল কলোনীতে থাকে। গতবার আকাশের জন্মদিনে তরুদের বাড়ী এসে বলেছিল সুনা, 'এখন খুব বড়লোক হয়েছে তো মিঠু, এমন ভাব করে যেন ওর মেয়েরা অন্য শ্রেণীর।' ডি. সি. ডি. ডি. জ্ঞানবন্ত সিং-এরও ধারণা একই। যে, এই নাট্যক্রিয়াটির অন্তরালবর্তী পরিচালক প্লাবনই। প্লাবন খুবই খারাপ ছাত্র। প্রাণেশ বছর আড়াই আগে ব্যাংগালোরে একটা প্রাইভেট ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ডোনেশন দিয়ে প্লাবনকে ভর্তি করে দেয়। মাস দুয়েক আগে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে প্লাবন না কি একটা কল - সেন্টারে চাকরী করছে। প্রাণেশ ওকে টাকাপয়সা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। হীরকের খবর যদি ঠিক হয় তো প্লাবন এখন দিল্লীতে থাকে।

তো, এই রহস্যময় চরিত্রটি নাট্যক্রিয়ায় প্রথম অংশগ্রহণ করে মিঠু বাড়ি ফিরে মন্টি রুমকে দেখতে না পাওয়ার ঘন্টাখানেক পরে। মিঠুর মোবাইলে ফোন করে বলে, এটাও সম্ভবত পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক, 'মিঠু আন্টি, মিঠু আন্টি, মন্টি রুম-রা হাওড়া স্টেশনে কি করছে? আমাকে ফোন করেছিল ওরা— হাওড়া স্টেশন থেকে।' প্লাবনের এই ফোনটা পেয়েই হীরক মিঠু হাওড়া স্টেশনে দৌড়োয়।

পরে প্লাবনকে ফোন করে পুলিশের হাতে ওকে তুলে দেবে বলে থ্রেটও করেছে হীরক, কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন কথা বার করতে পারেনি.। ডি. সি.ডি.ডি. -কে হিমানী— গতকাল রাতেই প্লাবনের মোবাইল নম্বরটা দিয়ে দিয়েছে।

তখনও মিসিং স্কোয়াডের অফিসারেরা আসেনি, প্লাবনের ফোন এল, 'মিঠু অ্যান্টি, তখনও আন্টি, ওদের দেখা গেছে,' তখন প্রায় দশটা বাজে— মানে রাজধানী যে সময় নিউ দিল্লী স্টেশনে পৌঁছোয়।

মিঠুর মুখে একগাল হাসি, চোখে জল নিয়েই সেই বলে, 'প্লাবন বাবা, তুই-ই এখন আমাদের ভরসা, তুই ওদের একটু আটকে রাখ।'

তরু ভাবে যদি প্লাবনের বিষয়ে হীরকের ধারণা ঠিক না হয়, তাহলে মন্টি বনাম ওর বাবা - মা, এই খেলাটায় হীরক - মিঠুর এটাই প্রথম খাতা-খোলা। সে মনে মনে হিসেব করে এ এখন স্কোর ৫৫-১ এবং স্কোর -বোর্ডটার চেহারা এখন এরকম—

মন্টি	হীরক-মিঠু
* রুমকে পুরো পরিকল্পনাটায়অংশগ্রহণ করার জন্য কনভিন্স করা----------১ * মিঠুকে আলমারির চাবিটা রেখে যেতে বাধ্য করা----------২ * মিঠুর গলায় সোনার চেনটা খুলে নেওয়া----------৩ * মিঠুকে বিভ্রান্ত করে রুমের স্কুলে পাঠিয়ে বাড়িটা ফাঁকা করা----------৪ * রুমকে নিয়ে সাফল্যের সংগে নিউ দিল্লী পৌঁছোনো----------৫	* প্লাবনের মারফৎ মন্টি-রুমের দিল্লী পৌঁছোনোর খবর পাওয়া-------১

এখন ডি. সি. ডি. যদি দিল্লী পুলিশকে ঠিকমত মবিলাইজ করে রেখে থাকেন সেক্ষেত্রেই হীরক - মিঠুর স্কোর আরো বাড়ার আশু সম্ভাবনা আছে। না হলে নয়। কিন্তু এর পরেই বোঝা গেল, স্টেশনে পুলিশ ছিল না বা পুলিশ ওদের ধরে নি। এরপর থেকে যত ফোন এল, তার সবগুলোই প্লাবনের মোবাইল থেকে, কিন্তু কথা প্লাবন বলছে না, বলছে মন্টি। প্লাবন ব্রেখটীয় ধরনে মাত্র দুবার যেন সূত্রধার হিসেবে নাট্যক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, নিজের অন্তরালবর্তী পরিচালকের ভূমিকাটিতে ফিরে গেছে।

মিঠু মন্টির কাজে জানতে চায়, 'কী চাস তুই?'

মন্টি জানায় যত সোনার গয়না নিয়ে গেছে, যার ভ্যালুয়েশন ওর ধারণা অনুযায়ী একলাখ টাকা— সেম আমাউন্ট টাকা ওর আই.সি.আই.সি.আই. ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। 'তাহলে তোমরা রুমকে ফেরৎ পাবে। রুমকে ফেরৎ পাবে আর গয়নাগুলো ফেরৎ পাবে।' এমনভাবে বলে যেন রুমকে হস্টেজ্ রেখেছে, মুক্তিপণ চাইছে। 'তোমার গলার চেনটা ফেরৎ চেও না, ওটা এখন আমি পরে আছি' মন্টি হাসে ফোনে।

তরু স্কোরবোর্ডে মন্টিকে এক পয়েন্ট বাড়িয়ে হীরক - মিঠুকে শূন্য করে দেয়। এখন স্কোর ৬-০। মন্টির পয়েন্ট বাড়ানোর কারণ, এত কিছু পরে আরো টাকা আদায়ের দরাদরিতে বাবা-মা-কে টেনে নামাতে পারা। আর হীরক-মিঠুকে শূন্য দেবার কারন— প্লাবনের ইনফর্মেশন দেওয়াটা তাদের কোন গেন নয় এটা প্লাবন - মন্টির পরিকল্পনারই এক পূর্ব নির্ধারিত ধাপ। ঠিক ভাবে দেখতে গেলে, প্লাবনের গতকালের ফোনটাও তাই, সে হিসেবে স্কোর এখন ৭-০। হীরক, তরু ও সোমনাথ কোন শব্দ করে না— যেন মন্টি ভাবে বাড়িতে মিঠু একা, 'তোরা কোথায়? স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেছিস?' 'তোমরা আমাদের ধরবে ভেবেছিলে? প্লাবনদা আমাদের বলে দিয়েছিল। আমরা আগের স্টেশনে নেমে বাসে করে এসেছি।'

ডিকেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসাররেরা তখন এসে গেছে। দেবশ্রী একটা সাদা কাগজে 'কনটিনিউ দ্য টক ফর ফিফটিন মিনিটস্, আমরা

ওর ফোন ট্র্যাক্ করছি' লিখে মিঠুর সামনে ধরে। ইতিমধ্যে ডি. সি. ডি. ডি. -কে ফোন করে সাদা - পোষাকের বাচাল পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় চরিত্রাভিনেতা ভদ্রলোকটি লেটেস্ট আপটেডটা জানিয়ে দিয়েছেন। দেখা গেল ওনার কাজই ঐ, কান - এঁটো - করা হাসি মুখ নিয়ে শুধু 'হ্যাঁ স্যার' —'সিওর স্যার' —'উই আর অন দ্য জব স্যার' এই সংক্ষিপ্ত ডায়ালগ তিনটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা।

এর মধ্যে বার বার মন্টির ফোন আসছে। ওর ফোনের কার্ড ফুরিয়ে যাবে বলে মিঠুকে বার বার বলছে ওকে ফোন করতে। আবার কথা বলতে নিজেই কেটে দিচ্ছে। ফোনে চেঁচাচ্ছে, যাচ্ছেতাই ভাষায় কথাটা বলছে, বারবার জিগেস করছে, 'কি মতলব করছ তোমরা?' মিঠু বলে, 'মন্টি তুই বড় হয়ে গেছিস, জগৎ দেখতে শিখে গেছিল— তোর যা ইচ্ছে কর। তুই রুমকে আর গয়নাগুলো ফেরৎ দিয়ে যা।' মন্টি বলে 'পুলিশ থেকে প্লাবনদাকে ফোন করে— ইডিয়ট, কি তোমার প্ল্যান— বলে ধমকেছে, ওকে প্লাবনদার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এখনই ফোন করে বল পুলিশকে প্লাবনদার কাছে অ্যাপলোজাইজ করতে।' এরকম হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কথাবার্তা বলেই যাচ্ছে। একবার রুমকে ফোন দিতে সেও মিঠুর সংগে জঘন্য ব্যবহার করল, 'আমি । যাবো। না।' 'ন্যাকামি কোরো না।' 'ড্রামা কোরো না।' —এইসব।

ইতিমধ্যে দেবশ্রী তার মোবাইল থেকে কোথায় কোথায় সব ফোন করছিল। মিঠুর সংগে মন্টির কথা চলতে চলতেই দেবশ্রী হীরককে জানালো, 'আমরা এ ছেলেটার মোবাইলটা ট্র্যাক্ করে ফেলেছি। ওরা তিনজন ব্যাংগালোরেই আছে। ইনফ্যাক্ট, আপনি ব্যাংগালোরে আপনার মেয়ের ফ্ল্যাটের যে ঠিকানা দিয়েছেন ওরা ঐ লোকালিটিতেই আছে। সম্ভবত ঐ ফ্ল্যাটেই। ডি.সি.ডি.ডি. কথা বলবেন আপনার সংগে।' দেবশ্রী নিজের মোবাইলটা দিল হীরককে। ফোনে ডেপুটী কমিশনার ছিলেন, তিনি বললেন, হোয়েন উই কুড লোকেট দম— আপনাদের বাড়ি থেকে কারো ওখানে যাওয়া উচিত। পুলিশ সরাসরি ইন্টারভেন করতে পারে , যদি আপনারা চান। কিন্তু দুটো ইয়াং মেয়েকে পুলিশ কাস্টাডিতে রাখা কি ঠিক হবে! তার চেয়ে দেখুন আপনারা যদি নিজেরা গিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনতে পারেন। আপনারা যদি বিকেলের ফ্লাইটে বেরিয়ে যান, কর্ণাটক পুলিশকে বলা থাকবে।'

এরপর মিসিং স্কোয়াডের টিমটা চলে যায়। যাবার আগে হীরক ওদের ফোন নাম্বার চাইলে, বাচাল অফিসারের চরিত্রাভিনেতাটি কায়দা করে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পর দেবশ্রী নিজের মোবাইল নাম্বারটা হীরককে দিয়ে বলে, 'যে কোন সময় ফোন করবেন আমাকে। কোন প্রবলেম হলে জানাবেন। আপনারা বেরোবার আগে আমি আপনাকে ফোন করে নেবো।' তৃতীয় অফিসারটি নীরব দর্শকের মতই নিঃশব্দে বিদায় নেয়।

বিকেলের ফ্লাইটে ব্যাংগালোর যাবার জন্য তৈরী হবার সময় একবার হীরক মাথা ঘুরে পড়ে গেল ঘরের মেঝের ওপর। গতকাল সন্ধ্যো থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। এর একটু পরে দেবশ্রীর ফোন এল, 'শুনুন যা খব পাওয়া গেল, আজ নয়, গতকালের—মানে ২৫শে মার্চের ফ্লাইটেই আপনার মেয়েরা ব্যাংগালোর পৌঁছে গেছে। আর গতকাল যদি ওর প্ল্যান ফেল করত তাহলে সেকেন্ড সেট প্লেনের চিকিটও কেটে রেখেছিল ২৮ তারিখের। একটা ক্রেডিট কার্ড দিয়েই টিকিট কেটে ছিল ইন্টারনেটে। ক্রেডিট কার্ডের নাম্বারটা মিলিয়ে নিন, নিশ্চয় আপনার ক্রেডিট কার্ড হবে।' হীরক নম্বর মিলিয়ে দেখল, এই ক্রেডিট কার্ডটা ওরই। যদিও ওটার কথা ওর খেয়ালই ছিল না। কোনও ব্যাংক থেকে ডক্টরস্ কমপ্লিমেন্টারি ক্রেডিট কার্ড হিসেবে পেয়েছিল ও এটা।

এয়ারপোর্টে যাবার সময় ট্যাক্সিতে হীরক বলে তরুকে, 'যদি নিয়ে আসতে পারি রুমকে, আর তালতলায় ঢুকবো না। যেমন বললি, আগামীকাল ওকে সোজা তোর বাড়ী নিয়ে চলে যাবো। ও নিজেও যখন থাকতে চাইছে না কলকাতায়—। রাতে আসানসোল যাবার কোনো ভাল ট্রেন আছে?'

তরু বলে, 'ট্রেনের ঝঞ্ঝাটে যাস না, এখন দুর্দান্ত রাস্তা হয়ে গেছে আসানসোল যাবার। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে আসানসোল যেতে রাতে হার্ডলি ছ ঘন্টা লাগবে। গাড়ী ভাড়া আমি দিয়ে দেব। তোর তো প্লেনে যাতায়াতেই অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে।' তরু হাওড়া স্টেশনের স্লিপার ক্লাস ওয়েটিং হলের উল্টোদিকে যে ইলেকট্রনিক বোর্ডে ট্রেনের যাতায়াতসংক্রান্ত ইনফর্মেশন দেওয়া হতে থাকে লাগাতার, সেখানে লক্ষ্য রাখছিল অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস কোন প্ল্যাটফর্মে দিচ্ছে। হঠাৎই হাওড়া স্টেশনের বিপুল কোলাহল নিভে গিয়ে চারধারে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। ইলেকট্রনিক বোর্ড থেকে ট্রেন সংক্রান্ত ইনফর্মেশন মুছে গিয়ে ফুঠে ওঠে ওকটা স্কোরবোর্ড...

মন্টি	হীরক-মিঠু
* রুমকে পুরো পরিকল্পনাটায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে রাজী করানো------১ * ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দু'প্রস্থ প্লেনের টিকিট কিনে রাখা------২ * মিঠুকে আলমারির চাবি বাড়ীতে ছেড়ে যেতে বাধ্য করা ------৩ * মিঠুর গলায় সোনার চেনটা খুলে নেওয়া------৪ * মিঠুকে বিভ্রান্ত করে রুমের স্কুলে পাঠিয়ে বাড়ীটা ফাঁকা করা------৫ * নিজের চিঠিতে ও প্লাবনের ফোনে মিঠু ও হীরককে বিভ্রান্ত করে হাওড়া স্টেশনে পাঠানো------৬ * রুমকে নিয়ে সাফল্যের সংগে ব্যাংগালোর পৌঁছোনো------৭ * নিজেরা রাজধানীতে দিল্লী পৌঁছেছে আজ, প্লাবনের ফোনে এরকম একটা বিভ্রান্তি জিইয়ে রাখা------৮ * রুমকে ও গয়নার বাক্সকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে হীরক - মিঠুকে ফারদার ব্ল্যাকমেল করা------৯	* পুলিশের সহাতায় মন্টি - রুমের ব্যাংগালোরে পৌঁছোনোর খবর পাওয়া------১

স্কোর ৯-১। সাংঘাতিক নিখুঁত ছক কাটা ও ততোধিক ত্রুটিহীন রূপায়ণ। ক্রাইন করার সময় মানুষের মস্তিষ্ক তার সম্পূর্ণ

ক্ষমতা নিয়ে সাহায্য করে মানুষটিকে— এবার অমিয়র সংগে দেখা হলে তরু এই অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্বটি বলে দেখবে। শুনে কি অমিয় 'কোথা থেকে মারলি এটা' বলে রিঅ্যাক্ট করবে? মনে তো হয় না।

৬। SUM TOTAL=K (যেখানে K হয় একটি ধ্রুবক)

হীরকের উত্থানের পেছনে ওর প্রবল পরিশ্রম করার ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও ম্যানেজমেন্টের ভাষায় যাকে বলে লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট— সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেওয়ায় যোগ্যতা ছাড়াও আরো দুটো ফ্যাক্টর কাজ করেছিল। দুটো নয় তিনটে। যদিও প্রথম দুটো ফ্যাক্টর অভিন্নও বলা যেতে পারে।

ফ্যাক্টর ১: 'ছিল রুমাল হ'য়ে গেল একটা বেড়াল'

উদ্বৃত্ত টাকা আছে বলে যারা কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলে রেখে দিয়েছে বা যারা চাকরীসূত্রে আছে কলকাতায়— তাদের তরু অন্তত কলকাতার লোক ভাবে না। কারণ এই মর্যাদা অর্জন করতে হলে অন্তত তিন পুরুষ কলকাতার এঁদো গলিগুলোর মধ্যের কোন একটায় ভাড়াটে হিসেবে থাকতে হবে। হ্যাঁ, 'ভাড়াটে হিসেবে' শব্দদুটিই হল কি-ওয়ার্ড।

হীরক ডাক্তার হবার পর প্র্যাকটিশও শুরু করে ভাড়াটে হিসেবে। তাদের বাড়িওলার বাড়িতে চেম্বার ভাড়া নিয়ে। অকৃতদার, কালো - বার্ণিশ - করা - ত্বকের বাড়িওলার এক ভাই ছিলেন ডাক্তার ও তিনি কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসা করতেন তাঁর পৈতৃক বৈঠকখানা ঘরের লাগোয়া ঘরটিতে। আর হীরক প্র্যাকটিশ করত ঐ বৈঠকখানা ঘরের আধখানা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে নিয়ে। বৈঠকখানা ঘরের বাকি আধখানায় ছিল ডাঃ মোদক ও হীরকের পেসেন্টদের কমন বসার জায়গা। হীরক চেম্বারে পৌঁছোতে দেরী করলে ডাঃ মোদক হীরকের দুয়েকটা পেসেন্টও ভাঙিয়ে নিতেন। ওঁর ছেলে ডাক্তারীর ছাত্র ও বাবার চেম্বারের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। ডাঃ মোদকের আকস্মিক মৃত্যুর পর বাড়িওলার অনুরোধে তাঁর ভাইয়ের কুকুরে কামড়ানো রোগীদেরও দেখা শুরু করে হীরক। ওঁর ছেলের পুরোদস্তুর ডাক্তার হয়ে বেরোতে দেরী ছিল তখনও। এটাই হচ্ছে সেই প্রথম গুণনীয়ক। ছিল নির্ভেজাল শিশু চিকিৎসক, হয়ে গেল পেডিয়াট্রিসিয়ান - কাম - কুকুরে - কামড়ানো চিকিৎসক। এর মধ্যে হীরক একবার হরিয়ানার কসৌটিতে গিয়ে ডগ বাইট তথা র‍্যাবিজ ট্রিটমেন্টের একটা শর্ট কোর্সও করে আসে।

ফ্যাক্টর ২: প্রখ্যাত কলকাতা গবেষকের কুকুরে কামড়ানো বৌ

কলকাতা - গবেষক অখিল কর্মকার ওরফে 'পথিকজন' ছিলেন আনন্দবাজার হাউসের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁর আলোড়ন-তোলা 'সাহেব ধরা' নিবন্ধে পথিকজন উল্লেখ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সেই সব বাঙালী মুৎসুদ্দি বাবুর শ্রেণীতে পড়েন, যারা অর্থবান হবার সাধনায় জাহাজঘাটায় বা বন্দরে ঘোরাখুরি করত বিলেত থেকে সাহেবরা এ দেশের মাটিতে পা ফেলামাত্র তাদের পাকড়াবে বলে।

এ হেন প্রখ্যাত কলকাতাবিদের বৌকে বাড়ির পোষা কুকুর কামড়ালে, সেই দুর্লভ রোগিনীটির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মিডিয়া হাউসটির সঙ্গে হিরকের একটা পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ক্রমে সে পথিকজনের এতটা আস্থা অর্জন করে যে তিনি হীরককে প্রায় পারিবারিক চিকিৎসকের মর্যাদা দিতে থাকেন। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে তিনি একদা - কবি হীরকের কুকুর কামড়ানো বিষয়ক একটি জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ ছাপার বন্দোবস্ত করে দেন। হীরকের উদ্যোগে আই. এ. পি.-র যত কর্মকাণ্ড প্রচারিত কাগজগুলিতে। এছাড়া দ্য টেলিগ্রাফের 'দ্য ডক্টরস্ ডেস্ক' কলামে হীরকের ছবিসহ সাক্ষাৎকারও ছাপা হয় একবার, মিডিয়ার সংগে এই র‍্যাপো পরবর্তীকালে হীরকের খুব কাজে লেগেছিল।

ফ্যাক্টর ৩: প্রবল সেমিনারবাজের তোতলামি

ডাঃ ননীগোপাল ব্যানার্জী ন্যাশনাল মেডিক্যালে হীরকের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতার এক টপক্লাস সেমিনারবাজ ডাক্তার। নিজের তোতলামির জন্য তিনি সংগে হীরককে নিয়ে সেমিনারে যাওয়া শুরু করেন। ডাঃ ব্যানার্জীর অসুবিধে ছিল সেমিনারের মূল লেকচারের পরের প্রশ্নোত্তর পর্বটিতে। এই কোশ্চেনেয়ার সেসনটিতে চিকিৎসক শ্রোতৃমন্ডলীর মুখের চাপা হাসি তাঁকে খুবই পীড়ন করত। আর শালারা যেন মজা মারার জন্যেই অন্যান্য বক্তার তুলনায় তাঁকেই ক্রশ করত বেশি। তরুর বড়মামা ছিলেন ধনী পিতার পয়সার বসে - খাওয়া বেকার লোক। বিয়ের স্ত্রী-আচার পালনের সময় নববধূকে দেওয়া তাঁর 'আজ থেকে তোমার ভাত - কাপড়ের ভার আমার বাবা নিল' প্রতিশ্রুতিটি আত্মীয়স্বজন মহলে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ডাঃ ব্যানার্জীর লেকচার - অন্তে বলা 'ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়্যারি, মাই স্টুডেন্ট হীরক উইল আনসার দেম' উক্তিটিও অনুরূপ স্মরণযোগ্যতা পেয়েছিল চিকিৎসক মহলে। হীরকের কল্পনাশক্তি এক্ষেত্রে তাকে খুবই সাহায্য করেছিল। এই সেমিনারবাজির পেছনের লুক্রেটিভ ব্যাপারটা সে ধরতে পেরে যায় এবং কালে কালে ঘাড়ের ওপর থেকে তোতলা ননীগাপালকে ঝোড়ে ফেলে নিজেই প্রবল সেমিনারবাজ হয়ে ওঠে।

তবে উদ্যোগী পুরুষের জীবনে এই ধরনের কোনো না কোনো সুযোগ আসেই— বিস্তারিত উল্লেখের কিছু নেই এর মধ্যে। উল্লেখযোগ্য যা, সেটা হল ডাঃ ব্যানার্জীর বলা একটা কথা— যাকে একটা অ্যানেকডোটও বলা যায়। হীরক সেদিন কোনো একজন বড় ডাক্তারের প্রসংগে কথা বলছিল, যার উত্থানপর্ব যৌবনে শুরু হয়ে চলছে তার প্রৌঢ়াবস্থা পর্যন্ত। মানে যিনি টপে উঠেছেন তো উঠেই চলেছেন আর থামছেন না। হীরক বলছিল, 'স্যার দেখুন, ওঁর ছেলেমেয়ে দুটোও কত ভালো হয়েছে। ছেলেটা এম. ডি.। মেয়েরও বিয়ে হয়েছে একজন এন. আর. আই. কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারের সংগে' ততদিন ননীগোপাল তাঁর ছাত্রের চোখে প্রবল উচ্চাশার অগ্নিশিখাটির ছায়া দেখতে পেতে শুরু করেছেন। তিনি হীরককে থামিয়ে বলেন, 'না হীরক, একজনের জীবনে সব ব্যাপারই দারুণ, এটা হয় না। তুমি খোঁজ নাও ভালো করে, নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে। হয় বৌ-এর সংগে বনিবনা নেই, নয় নিজের ক্যানসার। কিছু একটা থাকবেই। মানুষের জীবনে দেখো, সামটোটাল ইজ ইকোয়াল টুK । একদিকে বেশি পেতে গেলে অন্যদিকটা যাবেই— এটা একদম নিশ্চিত।' তুতলিয়ে তুতলিয়ে এতটা বলে তিনি রিপিট করবেন, বিধাতার মত, 'সামটোটাল ইজ ইকোয়াল টুK' — এবং এবার তিনি একটুও তোতলান না। এখন হয় কি, এই ইকোয়াল টুK ব্যাপারটা ঠিক অংক তথা সংখ্যা দিয়ে বোঝার ব্যাপার নয়। আর যার সঞ্চয় বছরে লাখের হিসেবে বাড়ে, সে এই বিমূর্ত হিসেব বুঝতে চাইবেই বা কেন? সে ভাবে: তিন বছর অন্তর গাড়ী পাল্টাচ্ছি কিনা, তাই হিংসে করছে।

হীরকের প্রথম গাড়ী ছিল সেকেন্ডহ্যান্ড অ্যামবাসাডার। দ্বিতীয়টি প্রিমিয়ার পদ্মিনী সেটাও সেকেন্ড হ্যান্ড। সেটা বদলে কেনা নতুন ঝকঝকে নীল মারুতি এইট হান্ড্রেড। যদিও নন - এয়ারকন্ডিশন্ড্। সেটাও বছর তিনেকের পুরোনো হতে না হতে নতুন এয়ারকন্ডিশন্ড্ কেনার পর তরু হীরককে না বলে পারে নি, 'বেকার বেকার স্ট্রেস্ করছিস কেন নিজেকে?' এইভাবে তুই কোথাও ল্যান্ড করবি না—

বলার ইচ্ছে থাকলেও, না, কেন মিথ্যে বলবে শুধু শুধু, সে বলে নি।

'আই.সি.এইচ.—এর পার্থকে দেখেছিস তো, আমার চেয়ে জুনিয়র, তোর এক - গ্রুপের, এখনই চাইল্ড সার্জারিতে কলকাতার প্রথম ৬/৭ জনের মধ্যে ও— পার্থ কি বলে জানিস? হীরকদা, ৩ বছরের বেশি কোন গাড়ী রাখবেন না, সেটি মোস্ট আন - ইকনমিক। পার্থর বাবাও ডাক্তার ছিলেন, ও ইয়ার্কী করে, বাবার সারাজীবন একটিই মহিলা আর একটিই গাড়ী। ঐ সেকেন্ডহ্যান্ড অ্যামবাসাডারের পেছনে বাবা যে কত টাকা ঢেলেছেন। রেগুলার মেনটেন্যান্স, দু বছরে একবার করে রং করা, গাড়ীর বডি রিপেয়ার, আপহোলষ্ট্রি বদলানো। ও সব এখন ব্যাকডেটেড।'

এই পার্থকে তরু হাড়ে হাড়ে জানে। হাড়ে হাড়ে না বলে নতমুখ নঙ্কুর চামড়ায় চামড়ায়ও বলা যায়। পোলোর পিসতুতো বোন রিয়ার ছেলের তুচ্ছ ফাইমোসিস অপারেশনের জন্য পার্থ গুনে গুনে ৮ হাজার টাকা নিয়েছিল। তাও রিয়ারা গিয়েছিল হীরকের রেফারেন্সে। সরাসরি গেলে কত নেয় সে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট কেন, সম্ভবত স্বয়ং ইশ্বরও জানে না। রিয়ার বর রাজীব নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্সের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তরুদা, ছেলের নঙ্কুর চামড়া নয়— যেন বাবার গলা কেটে নিল টাকাগুলো।' রাজীবকে নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড তেকে লোন নিতে হয়েছিল, ছেলের এই অপারেশনের জন্য। কিন্তু অত সব ভাবলে পার্থর চলবে কি করে? তাকে তো তিন বছর অন্তর গাড়ী বদলাতেই হবে। তার কাছে পেসেন্ট পার্টি মানেই জাল - ওটা রাঘব বোয়াল। পার্থ তো তবু ডাক্তারের ছেলে, দামী স্কুলে পড়াশোনা করা উচ্চাকাংখী। হীরকদের এই ম.মা.খা.সু. (মৎস মারিব খাইব সুখে) ক্লাবের অন্য একজন সদস্য হল বিকাশ। তালতলা পাড়ারই ছেলে। প্রতি সপ্তায় র‍্যাশন তোলাটা ছিল তরুর স্কুল জীবনের একটা কাজ, সেই র‍্যাশন দোকানে বসে বিকাশের বাবা চাল গম চিনির স্লিপ কাটছেন, এ তরু আবাল্য দেখে আসছে। পুরীতে ডাক্তারদের কোনো একটা সেমিনারে কলকাতার সবাই মিলে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে একসংগে হৈ হৈ করে যাবে, এই প্রস্তাব রিফিউজ করে বিকাশ বলেছিল, 'সরি হীরক, আমার বৌ ছেলে সেকেন্ড ক্লাসে চড়তে অভ্যস্ত নয়— আমিও ঐ সব কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী নই। হ্যাঁ, আমি মনে করি আমার ছেলেমেয়ে এভাবেই বড় হওয়া উচিত। ওরাও এরকম লাইভ স্টাইলই মেনটেন করবে ভবিষ্যতে।'

তরু অবাক হয়ে বলেছিল, 'সে বিষয়ে তোর বন্ধু এত সিওর হচ্ছে কি করে? ও ডাক্তার, জমিদার তো আর নয়। জমিদার হলে না হয় বলতে পারত, আমি জমিদার, আমার ছেলেও জমিদার হবে। ওর ছেলে তো দাদুর মত র‍্যাশনের দোকানে বসে চাল গম চিনির স্লিপও কাটতে পারে। অবশ্য যদি তখনও র‍্যাশন দোকান কনসেপ্টটা থাকে।' কিন্তু ওর বাবা, সর্বভারতীয় ম.মা.খা.সু. ক্লাবের পূর্বাঞ্চলের সেক্রেটারীর তখন এসব শোনার সময় কোথা? আর যার এ-ই শোনার সময় নেই সামটোটাল ইজ ইকোয়াল টুK -র দার্শনিক প্রতিপাদ্য সে বুঝবে কি করে!

৭। ভাটিগোর সেই মুহূর্তটি

যে কোন ক্রাইমের ক্ষেত্রে সব থেকে জরুরী হল প্রথম পদক্ষেপটি। প্লাবন মন্টির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যেটা ছিল রুমকে ক্রাইমটিতে অংশগ্রহণ করতে রাজি করানো। হীরকদের এয়ারপোর্ট পৌঁছোনো অবধি পুরো বৃত্তান্ত তরুর কাছে শুনে পোলো একটা অদ্ভুত কথা বলল। সপ্তাদুয়েক আগে হীরকের বাঁ চোখের অপারেশনের সময় তারা তালতলায় গিয়েছিল। সেসময় বেশ কয়েকবার নাকি মন্টির ফোন ধরতে চায় নি রুম। 'দিদিকে বলে দাও আমি বাড়ি নেই।' তার মানে কি তখন থেকেই মন্টি রুমকে পারসু করা শুরু করেছিল?

প্লাবন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে এবং দিল্লীতে কল সেন্টারে চাকরী নিয়ে চলে যাচ্ছে জানার পর প্রাণেশ ক্ষেপে গিয়ে ছেলেকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়। যদিও এখন বোঝা যাচ্ছে, পড়াশোনা ছাড়লেও প্লাবন ব্যাংগালোর ছাড়ে নি। আই.সি.আই.সি.আই. ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্টে মন্টির কলেজ ফি ও অন্যান্য খরচ খরচার জন্যে টাকা রাখত হীরক মিঠু সেখান থেকে দুটো মোটা থোকে পুরো টাকাটাই মন্টি তুলে নেয়। তাও হীরক যা বলল প্রায় ৫৫ হাজার টাকার মত।

এই টাকা তোলার ব্যাপারটাও রহস্যময়। হীরকের কথামত মন্টি না কি ঐ টাকাটা প্লাবনকে দিয়েছিল মোটরবাইক কেনার জন্য। হয়ত যে বিলাসী জীবনযাপনে প্লাবন মন্টি অভ্যস্ত তাতে এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু কলেজ ফি দেবার নাম করে আবার টাকা চাইলে হীরক অস্বীকার করে দিতে, 'আমার দুচোখ ফেকো হয়ে গেলে আমি চেন্নাই-এর নেত্রালয়ে যাবো চেক আপ করাতে। ফেরার পথে ব্যাংগালোরে তেমার কলেজে গিয়ে ফি দিয়ে আসব।' মন্টি বুঝে যায় পড়াশোনা না করলে সেও হীরকের কাছ থেকে টাকা পাবে না। যদিও আজ হীরক যখন তরুকে এই ঘটনাটার কথা বলছিল তখন তরুর মনে হয়েছিল হীরক ঠিক মন খুলে কথা বলছে না। শুধু হঠাৎ করে এতগুলো টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়ার জন্য নয়, হীরক আরো বড় কোন বিপদের আশংকা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওর চোখের ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশনের সময়ে হীরক তরুকে বলেছিল, 'মিঠু ওর দু মেয়েকে নিয়ে যেন একটা দল করছে। আমাকে কিছু খুলে বলে না, আমি যেন ওদের শত্রু।'

আর যা আজ শুনে এল, তা আরো ভয়ংকর। পরীক্ষায় ফেল করেছে, সপ্তাখানেক আগে এটা জেনে ফেলার পর সম্ভবত মন্টিকে প্রতিরোধ করার জোর হারিয়ে ফেলে রুম। টাকাপয়সা - গয়নার বাক্স কোথায় কি আছে সেটা ও-ই ডিটেল্‌স্ -এ জানিয়ে দেয় মন্টিকে। মন্টি ওকে বুঝিয়েছিল, ব্যাংগালোরে নিয়ে গিয়ে ও রুমকে ক্লাস টেনে ভর্তি করে দেবে। তোকে ভর্তি করতে তো অনেক টাকা লাগবে, অত টাকা কি করে জোগাড় করব?— এরকম কিছুই মন্টি বলে থাকবে রুমকে। তালতলার বাড়ির ছাদে ওঠার সিঁড়িটা একটা ছোট সাইজের করোগেটেড টিনের শেড দেওয়া ঘরে শেষ হয়েছে। ওখানে বাড়ির কাজের লোক কৈলাশ শোয় রাতে। ও শুনেছিল ঐ চিলেকোঠার দরজার বাইরে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে মন্টির সংগে মোবাইলে কথা বলছে রুম। ঘর অন্ধকার থাকায় রুম খেয়াল করে নি কৈলাস জেগে আছে। খুব ভোরে উঠে খাটাখাটি করতে হয় বলে কৈলাশের অভ্যেস হল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া। 'আমার বাবা কিছুতেই ব্যাংগালোর পাঠাবে না। তুমি আমায় নিয়ে যাও।'

রুমের ক্লাস - প্রমোশন না পাওয়াটা মন্টির কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগের মত এসেছিল। ক্রাইমের এটাও একটা মজার দিক, শয়তান যেন অপরাধের দিকে অপরাধীর মন্ত্রমুগ্ধ এগিয়ে যাওয়ার পথের সব বিঘ্ন নিজের হাতে সরিয়ে দেয়। এই সুযোগ ছাড়বে কেন মন্টি, ছাড়ার তো কথা নয়— সে রুমকে সম্ভবত বোঝায় টাকা জোগাড় করতে পারলে ক্লাস নাইনে ফেল করলেও ব্যাংগালোরে ক্লাস টেনে ভর্তি হওয়া সম্ভব। রুম এত ডেসপারেট হয়ে গেসল যে ও মন্টিকে অবিশ্বাস করে নি। তাছাড়া মন্টি ইলেভেনে ফেল করার পর হীরক কি ভাবে মন্টিকে প্রাইভেটে ভালো ক্লাস পাশ করিয়ে শুধু টাকার জোরে ব্যাংগালোরের কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি করেছিল, সেটা রুমের দেখা ছিল। কাজেই টাকা থাকলে ব্যাংগালোরে সব কিছুই সম্ভব, মন্টির এ কথায় অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ওর ছিল না।

'বাবার অন্য চোখটায় ফেকো হবে, তার টাকাটা আলমারিতে আছে, পেসেন্টদের ভ্যাকসিন কেনার টাকা আছে। কাকুসোনা সন্টাকাকার

জন্যে টাকা দিয়ে গেছে সেটাও আছে। মায়ের গয়নাগুলোও আলমারীতে রাখা আছে। বিয়েবাড়িতে পরবে বলে ব্যাংক থেকে তুলে এনেছিল, এখনও লকারে দেয় নি।'

দুর্ভাগ্য এটাই কৈলাশ বুদ্ধিমান ছেলে হওয়া সত্ত্বেও হীরকদের কিছু জানায় নি। বাচ্চা ছেলে, গরীব। ভেবেছে, বললে ওর চাকরীটাই যাবে।

তবে শেষ পর্যন্ত যে রুমের একটা দোটানা ছিলই, সেটা একটা ঘটনায় ধরা যায়। রুম কয়েকদিন আগে মিঠুকে বসে, 'তুমি গয়নাগুলো এতদিন বাড়ীতে ফেলে রেখেছকেন? লকারে রেখে আসতে পারো তো।' ভার্টিগোর এই মুহূর্তটিতে যখন ১৬ বছরের রুমের বিপদগ্রস্ত কিন্তু নিরাপত্তাময় বর্তমান ও বিপদমুক্তির হাতছানি দেওয়া অথচ নিরাপত্তাহীন ভবিষ্যৎ মিশে গিয়েছিল তখন ও ঠিক কি অনুভব করেছিল— তরুর সেটা জানতে ইচ্ছে করে। তরুর জানতে ইচ্ছে করে, ঐ মুহূর্তেই কি ওর এতদিনের অস্তিত্বের মৃত্যু ও অন্য একজন অধিকবয়স্ক রুমের নবজন্ম হয়েছিল! ঐ মুহূর্তটি থেকেই এই বাড়ীটা যেখানে ও শৈশব থেকে বড় হয়ে উঠেছে সেটা ওর সম্পূর্ণ অচেনা লাগতে শুরু করেছিল কিনা— তরু সেটা জানতে ইচ্ছে করে।

৮। মম অন্তর - মন্দিরে জাগো, মাধব - কৃষ্ণগোপাল

হীরক না মিঠু— কে বেশি দায়ী এই বিপর্যয়টির জন্য? না কি ওরা নয়, মন্টি ওর স্বখাত সলিলে ডুবে মরছে এবং রুমকেও ডোবাচ্ছে? তরুর মন গত ২৪ ঘন্টা ধরে পুরো ঘটনাটির অর্থ, হ্যাঁ ঘটনাটির কারণ নয়— ঘটনাটির অর্থই খুঁজছে আর প্রতিবারই এই প্রশ্নটায় ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে, রক্তাক্ত মুখে বসে পড়ছে। যুক্তির ওপর তরুর অগাধ বিশ্বাস, কিং অফ রিজন -ও বলা যায় ওকে, এই ঘটনাটির প্রবল অযৌক্তিকতা ওর গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে ওর হাতের ঐ ললিপপটি তথা যুক্তিসমূহ কেড়ে নিয়েছে। হায় সে এখন কি চাটবে তাহলে। শূন্য হাতে নাথ হে, ফিরি পথে পথে।

এই নয় যে যুক্তি - চাটার বিপজ্জনক দিকটি ওকে কেউ খুলে বলে নি। অন্তত ও নিজে তো নিজেকে বলেছেই। বই খুলে খুলে ও নিজেকে দেখিয়েছে, তুমি যুক্তি মানো অর্থাৎ দানবকে মানো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। দানবই কি তবে এই অ্যানার্কির যুক্তি? সে-ই কি অর্থ ঘটনাটির? মন্টির মধ্যেই কি লুকিয়ে ছিল সে! হাত ও পায়ের শৃংখল ছিঁড়ে সেই স্বেচ্ছাচারীই কি এভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে? মন্টি যখন ছোট ছিল তখন ছুটিতে তরু বাড়ি গেলে তার একটা কাজ ছিল মন্টিকে গল্প বলা। ওর মাম্মাম, মানে তরুর মা ওকে বলেছিল, 'আমি গল্পটল্প জানি না। তোর কাকুসোনার ঠাকুন রামায়ণ - মহাভারতের অনেক গল্প জানত— সব গল্প তোর কাকুসোনাকে বলে গেছে। বাড়ি এলে কাকুশোনার কাছে গল্প শুনিস।' মন্টির প্রিয় ছিল গরুড় পাখির গল্প। সূর্যের রথের ঘোড়ার লেজের রং সাদা না কালো, সেই নিয়ে গরুড়ের মা বিনতা ও তার সতীন সর্পমাতা কদ্রুর বাজি ধরা নিয়ে গল্পের শুরু। মাকে সতীনের দাসীবৃত্তি থেকে উদ্ধার করার জন্য স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সংগে যুদ্ধ করে গরুড়ের অমৃত নিয়ে আসা অবধি দীর্ঘ গল্পটি শুনতে শুনতে তখন - কিন্ডারগার্ডেনে - পড়া মন্টি উত্তেজনায় নিঃশ্বাস ফেলা বন্ধ করে ফেলেছিল। সেই উত্তেজনাপূর্ণ শিশুমুখটির ছবি আজও ১৮ বছরের ওপার থেকে ভেসে আসে। গল্প শেষ হলে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'কাকুসোনা, এই গল্পটা না, তোমার বেস্ট!' ওহ্, কি গুছিয়েই না কথা বলতে পারত মন্টি। না হেসে থাকা যেত না ওর কথা শুনে।

মনাই, তোকে কি বলি নি, আমি ঘোড়ার লেজের রংটা কালো নয়, সাদাই ছিল! কাকে এবং কিসে বিশ্বাস করে মন্টি এরকম ঠকে গেল, বুঝতে পারে না তরু। না কি বিশ্বাস নয়, কিছু তে বিশ্বাস না করতে পারাই ওর এরকম ঠকে যাবার কারণ!

প্লাবনের সংগে অ্যাফেয়ারটা ওকে এতটা বদলে দিয়েছে এটা যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। ডি. সি. ডি. হীরককে বলেছেন, 'আমি আপনার বন্ধুর ছেলের সংগে কথা বলেছি। হি ইজ এ পারফেক্ট ক্রিমিনাল! কাওয়ার্ড, স্পাইনলেশ! হি ইজ দ্য মাস্টারমাইন্ড অফ দ্য হোল প্ল্যান, বাট হোয়েন আই আস্কড্ হিম, হু আর ইউ অ্যান্ড হোয়াট দ্য হেল ইউ আর ডুয়িং দেয়ার?— বলে কিনা: স্যার, আমি ওদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছি যেন ওরা বাড়ি ফিরে যায়।' কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রিপিট করেন, 'আপনার মেয়ে ওর বিষয়ে যতই ইনফ্যাচুয়েটেড হোক, আমার প্রফেসনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি, ও ছেলে একটা হার্ডকোর ক্রিমিনাল।'

এরকম একটা ললিপপ হাতে পেলে, চাটতে তো তরুর ভালই লাগত, প্লাবনের পাল্লায় পড়েই মন্টি এরকম বিগড়ে গেছে, মন্টির বাবা - মা সমেত তাদের পরিবারের এতে কোন দায় নেই। কিন্তু তরু জানে আস্তানা অত সিধে রাস্তায় নেই— প্রবল অযৌক্তিক ঘটনাটির অর্থ এই মেড - ইজিতে পাওয়া যাবে না। যদি বিগড়োনোর কথাই ওটে তো কি বিগড়িয়েছে আগে— সেটা দেখতে হবে!

বিখ্যাত কলকাতা - গবেষকের কুকুরের কামড়ানো বৌ ও সেমিনারবাজ তোতলা ডাক্তার, এই দুজন হীরকের উত্থানের পরোক্ষ দুটি উপাদান হলেও কালপর্বের দিক থেকে এই উত্থানের সংগে হীরকের ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের কলকাতা শাখার, পরে ওয়েস্ট বেংগলের ও আরো পরে ইস্ট জোনের একজন কর্তা ব্যক্তি হয়ে ওঠার একটা রহস্যময় সমাপতন আছে।

তরুর মনে হয় এই সব প্রতিষ্ঠানে থাকা উল্লেখযোগ্য কর্তা ব্যক্তিদের (সচরাচর যাদের মিডিয়ার সংগে ভালো যোগাযোগ থাকে ও যারা সেমিনারবাজিতে পোক্ত), ওষুধনির্মাতা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো খরিদ করে ফেলতে চায়। এই বারগেন -এ তারা অঢেল খরচও করে। তবে এটা তরুর ধারণাই, হীরক মুখ ফুটে এ বিষয়ে কিছু তাকে কখনও বলে নি। এটাও তরুর ধারণা— এই এম. এন. সি. - গুলো শুধু যে হীরকের দেশে বিদেশে সেমিনারে লেকচার দিতে যাওয়ার জন্য প্লেনে যাতায়াতের ও ফাইভ স্টারে থাকার খরচ স্পনসার করে তা নয়। এ ছাড়াও লেকচারের মাধ্যমে চিকিৎসক মহলে তাদের লঞ্চ - করা নিত্য নতুন ভ্যাকসিনের প্রচার, নতুন পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা ওষুধের প্রয়োগসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের প্রোজেক্টগুলিতে যুক্ত থাকা ইত্যাদির জন্যও হীরক এদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে একটা বড় অংকের টাকা পায়। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে হীরক কখনও খোলসা করে কিছু বলে না বলেই তরুর মনে হয় এর মধ্যে আন-এথিকাল কর্মকাণ্ডও আছে কিছু। হীরকের এত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জনের অন্য কোন উৎস তো আর চোখে পড়ে না তরুর। হীরক দুর্ধর্ষ ছাত্র ছিল এবং ওর ক্লিনিকাল আই -ও দুর্দান্ত। কিন্তু সেভাবে মন দিয়ে ও প্র্যাকটিস করে কোথায়?

কথা সেটা নয়, কথা হল আলিবাবার রত্নগুহার দরজা এরকম অভাবনীয় উপায়ে চিচিংফাঁক হয়ে যাওয়ার পর অতিদ্রুত যে আর্থিক সমৃদ্ধিটা এল হীরকের জীবনে, তাঁর সংগে হীরকের তাল না রাখতে পারাটা। প্রায় নেশাড়ু-র মত সে এইসব কার্যক্রমে এতটাই জড়িয়ে পড়ল যে মন্টির পড়াশোনার জন্য একটুও সময় দিতে চাইত না। রুম তখনও ছোট। মন্টির পড়াশোনার দিকটা বারবার হীরকই দেখত বলে মন্টি পড়াশোনার ব্যাপারে তার বাবার ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। আর হীরকের যা স্বভাব যখন যা করে তা মন প্রাণ ঢেলে করে, মন্টির পড়াশোনাও এ-টু - জেড ও নিখুঁতভাবে দেখত। হঠাৎ ঐ সাপোর্টটা চলে যেতে মন্টি ক্রমে পড়াশোনায় খারাপ করতে শুরু করে। ইংরেজী মাধ্যমে পড়ার জন্য মন্টির পড়াশোনায় মিঠু একেবারেই কোন সাহায্য করতে পারত না। ভাল ছাত্রী থেকে মিডিওকার ছাত্রী হয়ে

পড়ার জন্য মন্টি পড়াশোনায় মনোযোগ ও আগ্রহ দুই-ই হারাতে থাকে। সংগে সংগে কমতে থাকে ওর আত্মবিশ্বাস। ও তখনও ছোটবেলার মতই ঠাণ্ডা আর ভীতু। হীরক সম্ভবত অদ্ভুত এক অপরাধবোধ থেকেই পড়াশোনা নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ ওকে প্রচণ্ড বকাবকি করে। তরু পোলো তালতলায় থাকলে বাবার ঝকাঝকার সময়টা কোণের ঘরে ওদের কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর বালিকা - মুখ কিরকম একটা আতংক ও বিভ্রান্তির ছায়া পড়ে এই সময়ে।

শুধু মন্টির ব্যাপারে নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও হীরক খুব হঠকারিতা করছে, মনে হত তরুর। দুর্দান্ত একটা বন্ধু - বৃত্ত ছিল হীরকের। এই একটা ব্যাপারে হীরককে বারবার ঈর্ষা করে এসেছে তরু। সেইসব নাটকসাহিত্যফিল্মপাগল লিটল ম্যাগাজিনের কম - সেয়ানা বন্ধুবান্ধবীদের নিজের জীবন থেকে সে নির্মম ভাবে ছেঁটে ফেলে। তাদের দোষ সম্ভবত এই যে তারা ধনী নয়। তার বন্ধু - বৃত্তে তখন পার্থ ও বিকাশের মত যত হামবার্গ আপস্টার্ট। তারও মধ্যে ঘনিষ্ঠতম হল সুশান্ত ও প্রাণেশ, এই দুজন চিকিৎসক বন্ধু ও তাদের পরিবার, মিথ্যে না বলতে কি, যে গ্রাম্য, মফস্বলী বা শহুরে ছেলের কোনদিন আর্বান হয়ে উঠতে পারে না তাদের মূলগত অশিক্ষার জন্য, সে তার জীবনে যতই উন্নতি করুক না কেন— হীরকের এই দুজন বন্ধু সেই ক্যাটাগরির। এরকম দুজন বন্ধু থাকায় হীরকের আর কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় নি। না, শুধু প্রাণেশের ছেলে প্লাবনের কারণে এটা ভাবে না তরু, সুশান্তর বৌ রত্নাকে দেখেই তরু একথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। রত্নার মত মহিলার বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো, তরুর ধারণা ও নবকলেবরে লেডি ম্যাকবেথ।

ম্যাকবেথ নাটকে লেডি ম্যাকবেথের যা ভূমিকা, তা সবাই জানেন। কাজেই সুশান্তর জীবনে রত্নার ভূমিকাটি বিশদ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আশপাশের মানুষের জীবনে লেডির ভূমিকা কি ছিল তা শেক্সপীয়র বলে যান নি। তাই এই কাহিনীতে রত্নার ছোট্ট কিন্তু তরুর মতে তাৎপর্যময় ভূমিকাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

মিঠুকে পারিবারিক কারণে স্কুল ডিঙিয়েই নার্সিং -এ ঢুকে পড়তে হয়। তার বোন সুমনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ও ভাই শমী এম. ডি. ডাক্তার। এদের পাশে মিঠুকে ম্লান লাগলেও তরু দেখেছে ও এলিমেন্টালি অত্যন্ত শিক্ষিত মানসিকতার মেয়ে। হীরকের আকস্মিক পরিবর্তনটার প্রভাব ওর ওপর সেরকম ভাবে পড়ে নি। হয়ত পড়তও না, যদি না হীরক সুশান্তদের সংগে অত ঘনিষ্ঠভাবে মিশত। রত্নার মুখটা সুন্দর কিন্তু শরীরটা ছোট্ট ও লাবণ্যহীন। ঐ সবসময় কোলকুঁজো হয়ে থাকা খর্খরে চেহারা একটি মহিলা যে কি করে মিঠুকে এতটা প্রভাবিত করতে পারল সেটা তরুর কাছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পোলোর পণ্যপ্রেম নেই বললেই চলে, এছাড়া ওর আরেকটা গুণ হল ও পরনিন্দা করে না, অন্তত তরুর সামনে করে না। ও অবধি বলেছিল একদিন, 'দিদি রত্নার সংগে কি করে মেশে কে জানে। খালি এই কিনলাম আর ঐ কিনলাম। গড়িয়াহাট মার্কেট, শ্রীরাম আর্কেড, ফোরাম, চার্নক সিটি, বিগ বাজার ছাড়া মুখে আর কোনো কথা নেই।'

রুম একটু বড় হবার পর দেখা গেল, মন্টি ছোটবেলায় যেমন ছিল, ও তত শার্প নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের দিক থেকে একেবারে বাবার ক্ষুদ্র সংস্করণ। মন্টি ঐ বয়সে ছিল ওর মায়ের মত। শান্ত, বাইরের মানুষজনের সামনে চুপচাপ ও লাজুক। রুম ওর একেবারে উল্টো। বাবার আই. এ. পি. -র ফাংশানে গটগট করে স্টেজে উঠে গেস্টদের মালা পরানোয় চৌখস। একবার বাবার সংগে মনিপুরের একাট সেমিনারে গিয়েছিল, এয়ারপোর্টে বসে আছে, সরোদিয়া আমজাদ আলি খানও ছিলেন ঐ দিন এয়ারপোর্টে— রুম যেভাবে গিয়ে ওঁর অটোগ্রাফ নিয়ে এল, হীরকের মুখে সে গল্প শুনে সবাই মুগ্ধ। তখনই হীরক বলা শুরু করেছে 'মন্টিটা যা ক্যাবলা, কে বলবে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, রুম অত্যন্ত স্মার্ট হয়েছে।'

মিঠু এক গাল হাসে, 'সবাই বলছে জুনিয়র হীরক।'

হীরক তখন সবে ধনীশ্রেণীর বোলচাল মানে ট্রেনে এসি ছাড়া ভদ্রলোকে ট্রাভেল করতে পারে না, সাধারণ হোটেলে তো থাকাই যায় না— এসব বলা শুরু করেছে। আর তরু যেটাকে বলে পার্স্ট ল অফ আপস্টার্টস্, শুধু পড়াশোনা করলেই হয় না স্মার্ট হতে হয়— সে তো বলছেই।

হ্যাঁ, মন্টির ক্রমশ মলিন হতে থাকা মুখ, একদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সেদিনও তরু কোণের ঘরে, গল্পের বই পড়ছিল। সুশান্ত - প্রাণেশের সেদিন সপরিবারে নিমন্ত্রণ ছিল তালতলায়, ওরাও ছিল বাড়িতে। সেবার পোলো যায় নি তরুর সংগে, তরু সম্ভবত অফিসের কোন কাজে একা গিয়েছিল। ওকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিয়ে তারপর তরু জিগেস করে, 'কি হয়েছে, মনাই?'

বড় হয়ে গেছে তাই জড়িয়ে ধরতে পারে না মন্টিকে খেন ছোটবেলার মত, কিন্তু তরুর গলার স্বরে জড়িয়ে - ধরাটা ছিলই।

'রত্নাকাম্মাটা বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি, একেবারে বাজে।'

'কিছু বলেছে তোমায়?'

'সব সময় বলে, যখন দেখা হয় তখনই। মন্টিটা আনস্মার্ট, মন্টিটা কি রকম মোটা হয়ে গেছে, আরো কালো হয়ে গেছে, এরকম বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে যাচ্ছে কেন— এইসব। সবসময় বলে—।'

কি বলে তরু! আজ ভেবে ছটফট করে মধ্যরাতে বিছানায় উঠে বসে— উচিত ছিল, কিছু বলা অবশ্যই উচিত ছিল— হীরককে, মিঠুকে। বিশেষ করে মন্টিকে। 'আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।' জীবনানন্দ পড়ে নি কি সে! বোঝে নি কি, কী সর্বনাশ হতে চলেছে!

চোখ মুছে, এত জোরে রগড়ায় মন্টি চোখ, মনে হয় নিজের চোখ থেকে জল নয়, যেন স্বভাবের সব কোমলতা মুছে শুকনো করে নিচ্ছে মন। বলে মন্টি, তার মুখের রেখাগুলো এখন শক্ত, যেন পাথরের মুখ, 'দ্যাখো না, এবার কি করি। আর একদিন বলুক এসব কথা— এমন ইনসাল্ট করব না— এই বাড়ীতে আর ঢুকতে সাহস পাবে না—'

পোলোর ঘুম এমনিতে ঘন, কিন্তু তরু ডিস্টার্বর্ড্ থাকলে ও কি করে যেন টের পায়, 'কি হল, উঠে বসলে কেন?'

ভুল হয়েছিল, ভুল হয়েছিল, কিছু একটা করা উচিত ছিল আমার— অন্তত ওকে আমি ভালবাসি, আমার কাছে ও ছোটবেলার মতই একটা সোনা মেয়ে আছে আজও, এটুকু অন্তত বলা উচিত ছিল।

পল্লবী উঠে তরুর পাশে বসে জড়িয়ে ধরে ওকে, 'মন্টিদের জন্যে মন কেমন করছে?' তরু ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'পোলো, কেন আমরা যথেষ্ট ভালবাসতে পারি না ছোটদের, আমাদের মায়েরা এত ভালবাসতেন আমাদের— আমরা কেন পারি না সেরকম! তবে কি ট্রেনের ঐ হিজড়েটাই ঠিক বলেছিল?'

পোলো হিজড়ের ব্যাপারটা জানে, তরু বলেছে ওকে। হয়েছিল কি, আসানসোলে ফেরার সময় অগ্নিবীণা এক্সপ্রেসে একটা হিজড়ের দল ওঠে। ওদের পয়সা চাওয়ার মধ্যে কোনারকম অনুগ্রহ ভিক্ষা থাকে না। কিরকম একটা দাবী করার মত করে পয়সা চায় ওরা। অবচেতনায় বদ্ধমূল সংস্কারের মতই ব্যাপারটা, তরুর হিজড়েদের দেখলে একটা আনক্যানি ফিলিংস হয়। সেটা হয়ত অনেকেরই হয়, কিন্তু তরুর

ক্ষেত্রে যেটা অদ্ভুত ব্যাপার, পুরুষালী হিজড়েদের দেখলে ততটা নয়। যে হিজড়েগুলোর গলায় স্বর ছাড়া অন্যান্য সব কিছুই মেয়েলি তাদের দেখলেই এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রবল হয়। সেরকমই একজন মেয়েলি চেহারার হিজড়ে কাছে এসে হাত পাততে তরু দরকারের চেয়ে বেশি শক্ত হয়ে বসে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তার মুখের অভিব্যক্তিতে কি ঘৃণা ফুটে উঠেছিল?

হিজড়েটা তার অদ্ভুত স্বরে বলে, 'এত নিষ্ঠুর কেন তুমি?' যেন তরুর বুকে হাত বোলাচ্ছে, বুকের ইঞ্চি দুয়েক উপর দিয়ে থেকে নীচে ওরকম হাত বোলানোর ভংগি কোরে আবার ঐ অদ্ভুত গলায় বলে, 'তোমার হৃদয়টা যেন শালকাঠ।'

পল্লবী বলে, 'শোও, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়ো।'

৯। কৌন জিতা, কৌন হারা

২৭ মার্চ। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ফোন করল সোমনাথ, 'আপনি একবার ব্যাংগালোরে ফোন করুন। বৌদির মোবাইলে।'

ফোনে মিঠুর কান্নার আওয়াজ, 'দাদার সংগে কথা বলো।'

হীরক যা বলল তা ভয়াবহ বললে কম বলা হয়। কাল ব্যাংগালোর এয়ারপোর্টে পৌঁছে ওরা কর্ণাটক পুলিশের সংগে কনট্যাক্ট করে। পাঁচ - ছ জন সাদা পোশাকের পুলিস এসকর্ট নিয়ে প্রায় রাত বারোটা - সাড়ে বারোটা নাগাদ মন্টি যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে থাকে সেখানে পৌঁছায়। মন্টির ফ্ল্যাটটা দোতলায়। অত রাতে তিনজনে বেশ জোভিয়াল মুডে গল্পটল্প করছিল। রাস্তা থেকে ওদের গলা শুনতে পায় হীরক ও মিঠু।

পুলিশের টিমটার নেতৃত্ব যিনি দিচ্ছিলেন তিনি হীরক - মিঠুর সংগে মন্টিদের ফ্ল্যাটের দোতলায় যান। বকিরা নীচে দাঁড়িয়ে থাকে। দোতলায় মন্টির ফ্ল্যাট। দোতলার ল্যান্ডিং -এ ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজা ছাড়া একটা জানালাও আছে। জানলাটা একটু উঁচুতে । জানলাটা দিয়েই হিরক মিঠুকে সিড়ি দিয়ে উঠে আসতে দ্যাখে রুম। ও মন্টিকে সতর্ক করে দেয়। সংগে সংগে দরজা বন্ধ করে, ঘরের আলো নিভিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে দেয় মন্টি। পরিস্থিতি মুহূর্তে গেরিলা - যুদ্ধের মত বিদ্যুদগর্ভ হয়ে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে খুব দ্রুত ঘরের একটা কোণে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্লাবন মেঝের ওপরই একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল— এটা হীরক আবছাভাবে দেখতে পেয়েছে। তার পরের পুরোটা সময় প্লাবন ঐ ঘরের মেঝেতে নিঃশব্দে পড়ে থেকেছে— টুঁ শব্দ না কোরে। ওরকম মাঠের ঘাসের মধ্যে বিষাক্ত সাপের মত গা-ঢাকা অবস্থাতেই প্লাবন পরবর্তী নাট্যক্রিয়াটি পরিচালনা করে। ওর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে ওর নির্দেশ নিয়ে আসে মন্টি আর রুম। মন্টি সকালে টেলিফোনে যেমন এখন সামনাসামনিও সেরকমই আক্রমণাত্মক, 'যদি জোর করে ঢোকে, তাহলে গ্যাস জ্বালিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে দেব— সিনথেটিক ড্রেস পরে আছি। রুম গলায় ছুরি বসিয়ে দেবে। রুম, তুই ছুরিটা নিয়ে দাঁড়া।'

মন্টি সিংগল বার্ণারওলা ছোট একটা গ্যাল জ্বালিয়ে দেয় নিমেষের মধ্যে। একটা টেবিলের ওপর রাখা গ্যাসটার আগুনে ঘরের মধ্যে যে হালকা আলো হয় তাতে দেখা যায় রুম হাতে একটা ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানালাটা একটু উঁচুতে তাই মেঝেয় শুয়ে থাকা প্লাবনকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাংগালোর একটা অদ্ভুত শহর। অত চেঁচামেচি শুনেও কেউ বাড়ী থেকে বেরোয় নি। মন্টি চিৎকার করতে থাকে, 'কিচ্ছু করতে পারবে না তোমার ডিসিডিডি। আমি অ্যাডাল্ট, আমার ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করতে এলে আমি সোজা মানবাধিকার কমিশনে চলে যাবো।'

'আর তুই যে গয়না নিয়ে, টাকা নিয়ে, বোনকে নিয়ে চলে এসেছিস— এর প্রত্যেকটাই তো ক্রাইম—'

'বার করুক, সার্চ করে আগে বার করুক টাকা গয়না, তবে না ক্রাইম— আর রুম, ও তো তোমাদের অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ক্রাইম— ক্রাইম দ্যাখাচ্ছে! প্রমাণ করতে পারলে তবে না ক্রাইম!'

রুমও সমান তালে চেঁচায়, 'নীচে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? ডাকো ডাকো পুলিশকে! আমি বলছি তোমাদের টর্চার সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছি।'

হীরক বলে 'তোর দিদি কি ৫হাজার টাকার মাইনের কল সেন্টারের চাকরী করে তোর পড়ার খরচ জোগাড় করবে? ওতে তো ওর নিজের খরচও চলবে না।'

মন্টি বলছে, 'আমরা তোমাদের চেয়ে অনেক বড়লোক হব— পড়াশোনা না করলে বড়লোক হওয়া যায় না না কি?'

হীরক বলেছে, 'না, পড়াশোনা না করলে কিছুই হয় না— ঐ যে ৫ হাজার টাকার চাকরীটা পাবি কলসেন্টারে— সেটাও আমি তোকে ইংলিশ মিডিয়ান স্কুলে পড়িয়েছিলাম বলেই পাবি।'

'দেখে নিও পড়াশোনা না করেও তোমাদের থেকে লাকজুরিয়াসলি থাকতে পারি কি না—'

মিঠু বলেছে, 'হ্যাঁ চুরি করে করবি লাক্সারি। মাকে মিথ্যে কথা বলে মায়ের গলার হার খুলিয়ে নিয়ে, সেই হার গলায় পরে আছিস, এমন নির্লজ্জ তুই।'

'বেশ করেছি টাকা নিয়েছি, সোনার গয়না নিয়েছি, না হলে রুমকে স্কুলে ভর্তি করব কি করে?'

মিঠু বলে, 'তোকে রুমের কথা ভাবতে হবে না, তুই ছেড়ে দে ওকে, কাকুসোনা বলেছে ওকে আসানসোলে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দেবে— কাকুসোনা বলেছে ওকে মানুষ করবে—'

'কাকুসোনা ওকে মানুষ করতে পারবে আর আমি পারব না?'

রুমও এর মধ্যেই চিৎকার করে চলেছে, 'আমি। যাবো । না।' 'আমায় জোর করে নিয়ে গেলে আমি মাকে খুন করে দেবো।' 'কাকুসোনা তো সেই আমাকে ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দেবে— ক্লাস টেনে ভর্তি করতে কি পারবে?' 'আমি তোমাদের ঘেন্না করি।' এই সব। মন্টিও বারবার বলে ঐ কথাটা, 'আমি তোমাদের ঘেন্না করি।'

হীরক অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে থাকে, ব্লাডসুগারের পেসেন্ট, সদ্য একটা চোখে অপারেশন হয়েছে, তার ওপর ২৪ ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলেছে এই ধকল, বলে, 'আমায় একটু জল দে—'

জলটা অবধি দেবে না মন্টি, রুম বলে, 'দিয়ে দাও, জল চাইছে জল দিয়ে দাও।' জানালার ওপর রুম রাখে জলের ক্লাসটা। হীরকের একটা চোখে পুরো অন্ধকার, আর যে চোখটায় অপারেশন হয়েছে সেটাও পুরোপুরি ঠিক হতে না হতে এই কাণ্ড। প্রবল কান্নাকাটি ইত্যাদির

ফলে সে চোখটাতেও খুব পরিষ্কার দেখেতে পাচ্ছে না, ঘরটাও অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে জানালা থেকে গ্লাসটা নিতে গিয়ে ওর হাত লেগে জল ভর্তি গ্লাসটা ঘরের মধ্যেই পড়ে যায়। মন্টির একটা পোষা কুকুর আছে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন কনফার্ম করেছিল মন্টিরা ব্যাংগালোরেই আছে, তখন মিঠু বলেছিল, 'হ্যাঁ আমি একটা কুকুরের ডাকও শুনেছি টেলিফোনে, ওটা নিশ্চয় ব্যাংগালোরের ফ্ল্যাটের কুকুরটার ডাক।'

হীরকের হাত লেগে জলের গ্লাসটা বোধহয় কুকুরটার গায়ের ওপর পড়ে, কুকুরটার সংগে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে মন্টি, 'মেরে ফেলবে কুকুরটাকে । কুকুরটাকে মারতে এসেছে দুজনে এখানে।'

এরকম প্রায় রাত আড়াইটা অবধি চলেছে। হীরক মন্টিকে বলে, 'কাল সকালেই তুই তোর মাকে বললি ব্যাংগালোরে কিছু খেতে পাই না, কোপ্তা করে দাও। আমি জিগেস করলুম কিসের কোপ্তা খাবি— তুই বললি কাঁচকলার— না, এঁচোড়ের কোপ্তা খাবো— আমি বাজার করে আনলুম— তোর মা কোপ্তা রান্না করল, দুপুরে আমাকে তোরা ভাত বেড়ে খাওয়ালি— ২৪ ঘন্টার মধ্যে কি করলুম আমরা যে তোর এমন শত্রু হয়ে গেলুম?'

'ওসব কোন কথা হবে না, তোমরা আমাদের ঠকিয়েছ। যাও - যাও - যাও, এখান থেকে।' পুলিশের লোকগুলো আর ধৈর্য রাখতে পারে না। একে কর্ণাটকের লোক, বাংলা বোঝে না, তার ওপর এত চিৎকার চ্যাঁচামেটি। টিমটার লীডার হীরককে বলে, 'দেখুন আমাদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আমাদের সংগে আর্মস আছে আমরা দরজা ভেঙে ঢুকতে পারি যদি আপনি চান, কিন্তু তার যা কনসিকোয়েন্স হবে তার দায়িত্ব আপনার। হোয়াই ইওর ডটারস্ হেট ইউ সো মাচ?'

হীরকেরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়। পুলিশের গাড়ী করে অনেকটা চলে আসার পর হঠাৎ হীরক রিয়ালাইজ করে এটা একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হল। এত কষ্ট করে এদের ট্রাক্ করা হল— এবার এরা এখান থেকেও পালাবে। ও পুলিশকে বলে, 'আপনি আমাদের ফেরৎ নিয়ে চলুন। আমরা সকাল অবধি ওখানেই বসে থাকব।' যদিও হীরকের উচিত ছিল পুলিশকেই রাতে ওখানে গার্ড রাখতে বলা। পুলিশ - টিমটির লীডার অস্বিকার করেন হীরকদের ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, 'আমাদের ওপর ইনস্ট্রাকশন আছে রাতে আপনাদের একটা হোটেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার।'

হোটেলে আসার পথে, হোটেলে আসার পরেও, মন্টি ওদের ওপর তড়পে চলেছে মিঠুর মোবাইলে। তখন মিঠুও প্রবল উত্তেজিত, 'তুই যা ইচ্ছে কর— তোর জন্য আমি এক ফোঁটা চিন্তিত নই। রুমকে আর গয়নাগুলো তুই ফেরৎ দিয়ে যা।'

মন্টি বলে, 'এখনও তেমার গয়নার লোভ!'

কাছে যে হোটেলটা ছিল, তার ফোনে ওদের এরকম চেঁচামিচি করতে দেখেই হোক বা পুলিশের জিপে আসার জন্যেই হোক ওদের বলে দ্যায়, কোনো ঘর খালি নেই। শেষে পুলিশ অনেকটা দূরের একাট হোটেলে ওদের রেখে আসে।

রাত ভোর হতে না হতে আবার মন্টির ফোন আসে, 'তোমরা যদি টাকা দাও আর তলায় নেমে যদি দেখি পুলিশ নেই, রুমকে আর গয়নাগুলো ফেরৎ দিয়ে আসব—'

'এখানে আমাদের কাছে ফিরে যাবার ভাড়া ছাড়া ৩০ হাজার টাকা আছে— সেটা তোকে দিয়ে দেব, তুই রুমকে আর গয়না দিয়ে যা।'

সাতটা নাগাদ মন্টির ফ্লাটের টাটা ইন্ডিকম ল্যান্ড ফোনটায় ফোন করে মিঠু দ্যাখে নো রিপ্লাই। হীরক বসে, 'প্লাবনের যে মোবাইলটায় মন্টি ফোন করছিল, ওটায় করো।' ফোন করতে মোবাইল সুইচ্ড্ অফ মেসেজ আসে। ওদের মনে হয় মন্টি ওদের কনফিউজ করছে। একটা অটো নিয়ে তড়িঘড়ি মন্টির ফ্ল্যাটে গিয়ে দ্যাখে, ফ্ল্যাটের দরজায় তালা ঝুলছে। এসময় মন্টির একজন প্রতিবেশী, মিঃ কুমার, বেরিয়ে আসে, 'আমি দেখেছি তোমরা কাল রাতে এসেছিলে। এরা খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছে। আমরা এই কাপল্টাকে অবজার্ভ করি। এরা সম্ভবত বিয়ে টিয়ে করে নি, লিভ টুগেদার করে। দে আর লিভিং হিয়ার ফর লাস্ট সিক্স মান্থস্। বাট মাই ওয়াইফ টোল্ড মি, উইদিন দিজ সিক্স মান্থস দে হ্যাভ পারচেজড্ অল সর্টস অফ হোম অ্যাপ্ল্যায়েন্সেস, গ্যস, কুকিং ওভেন, মিক্সি, ফ্রিজ, প্রেসার কুকার। ইলেকট্রিক আয়রণ— অ্যান্ড অল ভেরি কস্টলি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। ওদের একটা খাট আছে ওক কাঠের তৈরী, মাই ওয়াহফ সেড্ — ইট ইজ এ শো পিস! দে রিয়েলি লিভ লাক্সুরিয়াসলি! রোজ সকালবেলা এরা বেরিয়ে যায়— সন্ধ্যেবেলা আলাদা আলাদা সময়ে ফেরে। কোন কাজ টাজ করে। দে ডোন্ট মিক্স ইউথ এনিবডি। দে ডোন্ট ইভন স্মাইল টু আদার্স!'

হীরকেরা অটোটা ছেড়ে দিয়েছিল। মিঃ কুমার অটো স্ট্যান্ড অবধি নিজের গাড়ীতে ওদের পৌঁছে দেন। হোটেলে ফেরার পর হীরক ফোন করে সোমনাথকে বলে তরুকে আর হিমানীশকে ফোন করতে।

ফোনে এই ইতিহাসটা পুরো হীরকের কাছে শুনে তরু রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, 'তুই এভাবে ওদের চলে যেতে দিলি? কি লাভ হল তাহলে— গত ৩৬ ঘন্টা ধরে এত কাণ্ড করে? পুলিশ ওখানে গার্ড রাখল না— তোরাও চলে এলি!'

'হ্যাঁ, ডি. সি. ডি. ডি. -ও হিমানীশকে বলেছেন, ব্যাংগালোর পুলিশ এটা একটা ব্লান্ডার করেছে, রাতে গার্ড রাখা উচিত ছিল।'

'খুব অন্যায় করেছে পুলিশ।'

'কিন্তু তরু, কাল রাতে ওরা আমায় এক গ্লাস জল দিতে চায় নি। বললুম, এত রাতে কোথায় যাবো, তোরা শুধু মাকে রাতটা তোদের ঘরে থাকতে দে, আমি ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়িতে বসে কাটিয়ে দেব, সেটাও শুনল না। এই যাদের অ্যাটিচ্যুড তাদের কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আমি কি করব আর কোথায় রাখব।'

'সেটা ছিল ওদের তুলে আনার পরের চিন্তা। কালকে যে খেলাটা ওরা খেলল না ওটা খুব প্ল্যান করে করেছে। আমার তো মনে হচ্ছে ওরা বুঝতে পেরে গেসল, জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে, আর পালাতে পারবে না, পুরো জিনিসটা— ড্রামাটা রেডি করে রেখেছিল ঐ জন্যে—'

'না, ফ্ল্যাটের জানাল দিয়ে রুমই প্রথমে আমাদের দেখতে পেয়ে মন্টিকে বলল—'

'কিন্তু ছুড়ি আগুনটাগুন নিয়ে রেডি হয়েছিল মানে—। কলকাতায় যতবার ফোন করেছে মন্টি, মা-কে বলেছে, তোমার মতলবটা কি, তোমার মতলবটা কি! হয়ত তোরা ফিজিকালি যাবি ভাবতে পারে নি, কিন্তু পুলিশ যে ওদের ট্র্যাক্ করেছে সেটা বুঝতে পেরে গেছে এবং আমরা কি করছি সেটা জানতে চাইছে।'

'রুমও তো বলছে জানিস? বলে, শুধু তোমারাই ভোগ করবে? আমরা ভোগ করব না? এক ঝটকায় তোমাদের কাছ থেকে এতগুলো টাকা বেরোলো আর তোমরা সবসময় শুধু কাঁদুনি গাও।'

‘ওরা কি বলছে তার কি কোন মানে আছে! ওরা তো পাগলামি করছে। ওদের পাগলাগারদে দেওয়া দরকার। রুমের ট্রিটমেন্ট দরকার, কাউন্সেলিং দরকার। ঐটুকু একটা বাচ্চাকে ছেড়ে দেওয়া যায়?’

‘তরু, এরা কতটা খারাপ হয়ে গেছে, তুই চিন্তাও করতে পারবি না। এখন আমায় বলছে মিঠু, মন্টির সংগে না কি প্লাবনের রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ হয়ে গেছে। ব্যাংকের ৫৫ হাজার টাকা তুলে নিয়ে ওরা গোয়ায় গিয়ে হানিমুন করে এসেছে। মিঠু আমায় মোটরবাইকের কথাটা মিথ্যে বলেছিল। মোটরবাইকটা মন্টি প্লাবনকে ব্যাংক থেকে লোন তুলে কিনে দিয়েছিল, মিঠুর নামে, মিঠুর সব জাল করে। মিঠু সেই লোন - এর কিস্তি এখনও শোধ করে যাচ্ছে। এ সবকিছু মিঠু এতদিন চেপে রেখেছিল আমার কাছে। দ্যাখ্, পুলিশ যখন একবার ওদের সন্ধান পেয়েছে— ওদের আবার ট্র্যাক ডাউন করতে পারবে। কিন্তু ধরলে তার কনসিকোয়েন্স কি হবে?’

তরু রীতিমত একটা ধাক্কা খায়, তবু বলে, ‘কনসিকোয়েন্স কি হবে— কিছু হবে না কনসিকোয়েন্স। পুলিসকে বল টাকাপয়সা সোনার গয়না এসব নিয়ে আমরা ওরিড নই। সে কাড়াকাড়ির ব্যাপার নেই, কিন্তু রুম-কে যেন ধরে আনে। আমাদের টাকাপয়সা সবই তো ওদের জন্যে। ওরা ইডিয়েটের মতে করছে কাজ— ঐসব টাকাপয়সা নিয়ে ওরা যদি শান্তি পায় পাক। কিন্তু রুম মাইনার— ওকে আমরা ফেরৎ চাই। বাচ্চাকে ছাড়া যায়— কিন্তু দুটো ইডিয়েটের হাতে ছাড়া যায়? ওরা পরে রুমকে নিয়ে কি করবে না করবে ভাবতেই তো আতংকে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পরে যে রুমের ওপরও অত্যাচার করবে না, তোদের ব্ল্যাকমেল করার জন্যে, তার কোনও ঠিক আছে?’

হীরক এবার ভেঙে পড়ে, ‘তরু, আমি আর পারছি না, গতকাল রাতে হোটেলে ফিরে আবার মাথা ঘুরে পড়ে গেছি। গত ৩৬ ঘন্টায় এই নিয়ে তিনবার এমন হল।’ ফোনে হীরকের কান্নার আওযাজ শোনা যায়।

স্নায়ু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ারই কথা, তরু বলে, ‘তুই চলে আয়, তুই ওখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেটা আর একটা বিপদ হবে।’

ফোন রেখে দেবার পর তরুর মনে হয়, এ বিষয়ে নিজের মতামত পরিষ্কার ভাবে ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। ও আবার ফোন করে মিঠুকে বলে, ‘চলে এস, আর একটুও দেরি কোরো না, চলে এস।’

মিঠু জানায়, সন্ধ্যের আগে কোনো ফ্লাইট নেই। ফিরতে ফিরতে রাত হবে। ফোন রেখে তরু ভাবল মন্টির স্কোরটা কত দাঁড়াল সেটা একবার হিসেব করে। অথচ হিসেবটা করতে গিয়ে সে দেখতে পেল, মুসাবনীর তামা খনির সেই ১৮ বছর আগের লিফটটায় একা দাঁড়িয়ে আছে মন্টি। গভীর কুয়োর মত এক উলম্ব ট্যানেল ধরে লিফটটা ভয়ংকর গতিতে ভূগর্ভে নেমে যাচ্ছে মন্টিকে নিয়ে, যেন পাতালের টানে। আর হু হু করে চারপাশ থেকে ক্রুর মাটি এগিয়ে এসে নিমেষে ভরিয়ে দিচ্ছে টানেলটি। নিশ্চিত দ্রুততায় ও নিঃশব্দে! সত্যি, মন্টির স্কোর তো এখন মাইনাস ১৮! যে খেলায় দুপক্ষই অপর পক্ষের কাছে বিপুল ভাবে পরাজিত— তার স্কোর কি সংখ্যা দিয়ে বোঝানো যায়! যায় না। কৌন জিতা কৌন হারা-র হিসেবটা তাই তরু স্থগিত রাখে আপাতত।